কংসনদীর তীরে

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

চিত্রা পাবলিশিং কোং
১৪।১, কলেজ রো, কলিকাতা।

প্রকাশক :—
শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী
চিত্রা পাবলিশিং কোং
১৪।১, কলেজ রো, কলিকাতা।

মূল্য—দেড়টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীগোপীনাথ রায়
শ্রীগোপাল প্রেস
৩৩।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

যে সকল রাজনৈতিক বন্দী
মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিবার
পুণ্যব্রতে দীক্ষা লইয়াছেন
তাঁহাদের করকমলে এই ক্ষুদ্র
গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

—গ্রন্থকার

১৩৪৪ সালের শেষ ভাগে 'কংসনদীর তীরে' উপন্যাসটি 'চিত্রা' মাসিকপত্রে লিখিতে আরম্ভ করি এবং ১৩৪৬ সালের মধ্য ভাগে শেষ হয়। রচনাকালে ধারাবাহিক গতি ও যোগসূত্র ছিল না, তাহার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধ এবং বিভিন্ন বিধি নিষেধের জন্য পুস্তকটির বহু অংশ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

প্রত্যেক চরিত্র এবং প্রতিষ্ঠান কাল্পনিকবাস্তবের সঙ্গে যদি কিছু সামঞ্জস্য রাখিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত, কাজেই মার্জ্জনীয়। যাহা আমি বুঝিতে পারি এবং বিশ্বাস করি তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; মতানৈক্য অপরিহার্য্য।

বন্ধুবর শ্রীমৈনাক, শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীসাগরময় ঘোষের নিকট সাহায্য পাইয়াছি সে জন্য এঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি

গ্রন্থকার

.........শ্রাবণ, ১৩৪৭

১২৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংস নদী!

গারো পাহাড় হইতে ছোট নদীটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। প্রশস্ত নয়—খরস্রোতা, উদ্দীপ্ত। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের উছল তরঙ্গ সারা দেহে খেলাইয়া বেড়ায়।

কংস নদীর দুই তীর ব্যাপিয়া কত অগণিত শস্য শ্যামল মাঠ, কত প্রান্তর, কত বনবনানী, কত পল্লীসহর ইতিহাসের পাতা সাদা রাখিয়া আছে। আবার কত বনবনানী, কত বন্ধ্যা প্রান্তর কাটিয়া চিড়িয়া, কত খাল বিল বুজিয়া শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কত জন-বহুল গ্রাম আগাছায় পূর্ণ হইয়া বনে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। অতীতের ইতিহাস মানুষ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, জনশ্রুতি ও কাহিনী মানুষ দুই দিন পর ভুলিয়া যায়। অতীতের ইতিহাস সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে, ভুলে নাই শুধু এই কংস নদী। কত ইতি-কথা, কত ইতিহাস, কত বিচিত্র ঘটনাবলী, কত দর্শন, কত ধর্ম্ম তাহার মনের গহন দ্বারে ভিড় করিয়া আছে। যুগ যুগ ধরিয়া প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অতীতের কাহিনীই রোমন্থন করিয়া চলে, দাম্ভিক মানব তাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না।

ওই যে কলকল ছলছল করিয়া স্বচ্ছ নদীর ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ তালে তালে ছন্দে ছন্দে নাচিয়া চলিয়াছে, তাহার অভ্যন্তরেই কত পুরুষ ও প্রকৃতির কত বিচিত্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। কংসই শুধু বলিতে পারে, কত নিপীড়িতা·কত ব্যথিতা কত বিরহী তাহার পাশে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে—হৃদয়ের পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা লাঘব করিয়াছে। কত ধীবর, কত মাঝি তাহাকে অবলম্বন করিয়া

জীবিকার্জ্জন করিয়াছে। কত কৃষক খাল নালা কাটিয়া তাহার অমৃতধারা মাঠে টানিয়া আনিয়া শস্যক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। আর একথাও শুধু কংসই বলিতে পারে যে, কত জলদস্যু, কত পাহাড়ী জাতি তাহার সহায়তায় কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

কংসনদীর পশ্চিম পাড়!

উত্তর দিকে মস্ত বড় এক বন, দক্ষিণ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা কৃষি-পল্লী, নিকটে আর কোন জন বসতি নাই। পূর্ব্বদিকে কংস নদী। নদীর পাড় ঘেঁসিয়াই শস্য শ্যামল ধরণী। বিস্তৃত আওরের পর জলদ মেঘের রেখার মত দেখা যায় সারি সারি পল্লীগ্রাম। যেন অসীম সমুদ্রের ওপারে দিকচক্রবালরেখা অর্দ্ধচক্রাকারে মাটির বুকে আসিয়া মিশিয়াছে।

অপরাহ্ণ!

একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। স্মিত মাঝিদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া একা একাই পাড়ে উঠিয়া আসিল। খোলা প্রান্তর দিয়া স্মিত আনমনে চলিয়াছে। অপরাহ্ণে নির্জ্জন বেলাভূমিতে বেড়াইতে তাহার ভারি ভাল লাগে! কি চমৎকার তার লাগে! ভাবিয়া সে কূল পায় না।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। রঙ্গিন আভা হালকা মেঘের স্তর অতিক্রম করিয়া নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাকাশে

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সপ্তবর্ণের কয়েকটি বর্ণ মূল আলোক রেখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গারো পাহাড়ের চূড়ায় আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ অপরিচিত নারীকণ্ঠের আহ্বানে থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে একটি যুবতী নারী মৃদু হাস্যে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সুমিত তাড়াতাড়ি হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া অবাক হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া হাসিমুখেই প্রশ্ন করিল, চিনতে পারলেন না?

সুমিত লজ্জিত হইয়া বলিল, অপরাধ নেবেন না, সত্যিই আপনাকে চিনতে পারচিনে! তবে একথা সত্যি, যে, আপনাকে কোথায় দেখেচি কিন্তু মনে পড়চে না!

সীমন্তী বলিল, সে কি? আমি যে আপনাকে দূর থেকে দেখেই চিনে ফেলেচি আর আপনি অতক্ষণেও আমায়—

সীমন্তী কৃত্রিম দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, বড় লোক আর গরীব লোকে এই পার্থক্য!

সুমিত বলিল, এ আপনার অন্যায় অভিযোগ। আমার বাবা জমিদার কিন্তু আমি জমিদার নই। সে যা হোক আপনার পরিচয়টা?

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, পরিচয় দেবার মত বিশেষ কিছু নেই নতুবা দিতে পারতুম।

সুমিত হাসিয়া বলিল, অবিশেষটাই দিন।

: সে ত' আমার চেহারাতেই আঁকা আছে! বুঝতে পারচেন না?

: না ত'?

: দুর্ভাগ্য ! ম্যাসিডই ঘেঁটেছেন, মানুষকে চিনতে শিখেন নি।

সুমিত হঠাৎ উল্লাসে বলিয়া উঠিল, এবার ধরেচি'!

: কি ধরলেন ?

: গত বুধবার কলকাতা থেকে আসবার সময় আপনাকে যেন ষ্টিমারে দেখেছিলুম ! ঠিক কিনা বলুন ?

সীমন্তী হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

সুমিত বলিল, এবার ভাল মনে পড়েচে। ময়মনসিংহ ষ্টেশনে পুলিশ আপনাকে ধরেছিল। কে যেন বলেছিল আপনি কংগ্রেসের নেত্রী।

সীমন্তী অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, [illegible] বনের ধারে যে এলেন, জানেন ওই বনে বাঘ বাস করে ?

সুমিত ছেলে মানুষের মত হাসিয়া বলিল, আমায় ভয় দেখাচ্ছেন ! জানেন আমি জমিদারের পুত্র !

: তা জানি কিন্তু বনের বাঘ ত' আপনাদের পশুত্বহীন প্রভুভক্ত প্রজা নয় যে আপনাকে ভয় করে চলবে !

: সে কথা সত্যি, মানুষ জন্ম থেকেই মনুষ্যত্বহীন হয় কিন্তু পশু পশুত্বহীন হতে চায় না ! আমি বেড়াতে এসেচি, বাঘে ধরতে পারে কিন্তু আপনাকে একা পেয়ে বাঘ খাতির করবে কেন ? কংগ্রেসের সার্টিফিকেট বাঘে মানে না !

: আমি জানতুম যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

: আপনি কি গুণতে পারেন ?

: কতকটা পারি বৈ কি ?

সুমিত ডান হাত প্রসারিত করিয়া ধরিয়া বলিল, বলুন ত'

অতীত জীবন! কি বলতে পারছেন না ও বুঝেছি!

: ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে বলতে পারি শুধু।

সুমিত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, জানেন আমি বৈজ্ঞানিক, ওসব ফাঁকি আমার নিকট চলবে না।

: বিনি পয়সায় হাত দেখলে লোকে বিশ্বাস করে না।

: যে অতীত জীবন সম্বন্ধে বলতে পারে না, সে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কি করে বলবে? অমন আমিও বলতে পারি।

: আচ্ছা বলুন ত'?

: বলব! মিষ্টিক, সুমিত নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার নদীর তীরে পরিচয় হবে! আপনি স্বদেশী কাজ করবেন। নাম যশঃ আছে, জমিদার ও ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা হবে—জেলও হতে পারে! আরও বলব?

: বলুন!

: সুন্দর এক সৎ যুবকের সঙ্গে বিয়ে হবে এবং যথেষ্ট টাকা পয়সা লাভ হবে! কংগ্রেস সেবা ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবন বরণ করবেন।

: জানেন আমি কংগ্রেস সেবিকা?

: চটলেন কেন? যদি কোন অন্যায় ব'লে থাকি তবে ক্ষমা করবেন।

: টাকা, কড়ি, বিয়ে, ব্যক্তিগত বিলাস কংগ্রেস কর্মীদের কাম্য নয়! তাদের সম্বন্ধে আপনার এমন ধারণা থাকা উচিৎ নয়! যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেসের সদস্য হয়েচে ওরা কংগ্রেস সেবক নয়। এ রকম মন্তব্য করা আপনার উচিৎ হয় নি!

: অন্যায় হয়ে গেচে! খুশী করতে গিয়ে আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেলেচি।

নিঃশব্দে দুইজন খানিকদূর আগাইয়া গেল।

সীমন্তী হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, সন্ধ্যা হ'য়ে এল। এবার ফিরতে হয়। নমস্কার গণক ঠাকুর!

: এত শিগগির ফিরবেন!

: ঘাটে নৌকা ত' আমার জন্যে বসে থাকবে না। সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়াও খুব সুখের ব্যাপার হবে না!

: আমার নৌকা আছে! কোথায় যাবেন?

: পূব পাড়ে, মিল কোয়াটারের কাছে।

: তবে ত' ভালই হল। আমিও সেদিকে যাব। চলুন বনের ধারে বেড়িয়ে আসি; এক সঙ্গে যাওয়া যাবে'খন।

: না। আমার কাজ আছে, আচ্ছা আসি।

সীমন্তী ঘাটের দিকে চলিল। সুমিত অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আশ্চর্য্য এই অপরিচিতা যুবতী। দেহে আগুন আছে চোখ ঝলসাইয়া দেয় কিন্তু তাহা কাঠের আগুন নয়, পুড়িয়া ছাই হয় না—ও লোহার আগুন, পুড়িয়া ইস্পাত হয়।

সুমিত একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, চলে যাচ্চেন। আমিও কিন্তু যেতুম। শুনচেন, দাঁড়ান।

সুমিত আগাইয়া আসিল। সীমন্তী যেন কেমন। ফিরিবার জন্য বিশেষ চিন্তিত, সুমিতের প্রতি মোটেই কোন কৌতূহল নাই।

সুমিত বলিল, বিয়ে এবং ঐশ্বর্য্যের কথা বলেছিলুম বলে আপনি

আমার ওপর ভীষণ চটে আছেন দেখচি! আমিও যাব।

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, আমি কি ছেলে মানুষ যে চটে থাকব! আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে সে জন্যই ব্যস্ত হয়েচি! দেরি করবেন না, চলুন!

দুই জনেই তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

সুমিত বলিল, আপনার সঙ্গে অতক্ষণ আলাপ হল অথচ আপনার পরিচয়টা পেলুম না।

: আমি কংগ্রেস সেবিকা, এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার আর কি থাকতে পারে! সত্য সত্যই ত' পরাধীন ভারতবাসীর নিকট এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু নেই।

: কিন্তু একটা নাম ত' আছে।

: মেয়েদের নাম জিজ্ঞেস করে নাকি কেউ?

: কেন কি হয় তাতে?

: সভ্যতার যুগে এই পদ্ধতি একেবারেই অচল!

: আপনাদের সভ্যতা নিয়ে আপনারা থাকুন, দূর থেকে জানাই নমস্কার! আমাদের মাইক্রস্কোপ বেঁচে থাক!

কথা বলিতে বলিতে তাহারা ঘাটে আসিয়া পৌছিল।

সুমিত বলিল, আচ্ছা কাজ আছে বলে যে খুব ইয়ে করছিলেন, খেওয়া নৌকা ত' ওপারে, কি করে যেতেন বলুন ত'—যান এবার সাঁতরিয়ে।

: তাই ত! খুব জব্দ করেছেন ত'!

সুমিত হাসিয়া উঠিল।

মোড়টা ঘুরিয়া একটা নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি কিশোর বালক সীমন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি তোমায় খুঁজে গেচি মা, দেরি দেখে ওদিক হয়ে এলুম।

সীমন্তী বলিল, তোকে আর যেতে হবে না বাবা, আমি এঁদের নৌকাতেই যাব।

বালকটী সীমন্তী ও স্থমিতকে প্রণাম করিয়া নৌকা নিয়া চলিয়া গেল।

সীমন্তী ও স্থমিত নৌকাতে আসিয়া উঠিল। স্রোতের মুখে নৌকাটি রাজহাঁসের মত নিঃশব্দ গতিতে চলিতে লাগিল।

স্থমিত বলিল, খুব বোকা বনেচি ত'।

সীমন্তী নিঃশব্দে হাসিল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর স্থমিত বলিল, আচ্ছা, নাম নঃ নাই বললেন, কিন্তু কোথায় থাকেন তা ত' বলতে পারেন?

: যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বাস করি।

: আপনি ত' ভারি অদ্ভুত মানুষ। সোজা কথা বলতে পারেন না? বলি একটা আস্তানা ত' আছে, যেখানে খুঁজলে আপনার দেখা পাওয়া যেতে পারে, তাই দয়া করে বলে দিন না?

: কেন পেয়াদা পাঠাবেন নাকি?

: পাঠাতুম, কিন্তু শমন যাবে কার নামে?

: আমার নামে!

: পরিচয় দিলেন না কিন্তু বিদেশিনীর পরিচয় পেতে যে বিশেষ বেগ পেতে হবেনা তা বলতে পারি!

তীরে আসিয়া নৌকা লাগিল।

সীমন্তী পাড়ে উঠিয়া বলিল, অশেষ ধন্যবাদ! নমস্কার!

: দাড়ান আমি যাচ্ছি!

: আপনি না এলেই ভাল হয়!

অপমানে সুমিতের মুখখানি লাল হইয়া উঠিল।

সীমন্তী বলিল, পলিটিক্যাল একটা ঘরোয়া বৈঠক আছে। বৈঠকে আপনাকে নিতে পারি না, মিছি মিছি কষ্ট করে কেন আর বস্তির ধারে আসবেন। আসি তবে—নমস্কার!

সীমন্তী দ্রুত পা ফেলিয়া নদীর বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুমিত অবাক হইয়া এই অদ্ভুত মেয়েটির ক্রমঅন্তর্ধানের শূন্য রেখা-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

নদীর বাঁক শূন্য হইয়া গিয়াছে। সাঁঝের আঁধার ক্রমশঃ অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

•

পরদিন প্রাতঃকালে সুমিত চা খাইয়াই বাহির হইয়া পড়িল। সীমন্তী তাহার মনের সর্ব্বস্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। যতই সে এই মেয়েটির কথা ভাবিয়াছে, যতই তাহার পরিচয় জানিতে পারিয়াছে ততই যেন তাহার মনে হইয়াছে এই দাম্ভিক মেয়েটি সাধারণ নয়। সমাজ-জীবনের মাপকাঠি দিয়া তাহাকে মাপা চলে না, সাধারণ মন দিয়া তাহাকে বিচার করা যায় না।

সীমন্তীর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে সুমিতের একটুও বেগ পাইতে হইল না। সকলেই এক ডাকে চিনে, কুলি মজুরগুলি তাহার নামে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করে।

দরজার কড়া নাড়া দিতেই সীমন্তী দরজা খুলিয়া সুমিতকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল, এত সকালে আপনি ?

সুমিত হাসিয়া নমস্কার করিল।

সীমন্তী প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, ভিতরে আসুন !

সুমিত সীমন্তীর পিছনে পিছনে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং নির্দেশ মত একটা ইজিচেয়ারে গিয়া বসিল।

সীমন্তী প্রশ্ন করিল, আমার খোঁজ কি করে পেলেন, আমার নাম ত' আপনি জানেন না ?

: পেয়াদাদের চিনিনা বল্‌লে চলেনা, খুঁজে বের করতে হয় নতুবা চাকরী থাকে না।

: আপনার মনিব বুঝি খুব রাগি মানুষ ?

: ভীষণ ! অনেক রাত পর্য্যন্ত ত' হুকুম করেচেই, খুব সকাল বেলায় ঘুম থেকে তুলে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েচে।

: আপনার মনিবের প্রশংসা করি !

: আর আমি বুঝি প্রশংসা পাবার উপযুক্ত নই !

: নিশ্চয়। অজানা একটা মহিলাকে অজানা স্থান থেকে বের করা সোজা কথা নয় ! কি করে বের করলেন ?

: এক নম্বর বাড়ী থেকে জিজ্ঞেস করে চলেছি !

: আপনি ত' কম নন্। আচ্ছা কি জিজ্ঞেস করলেন ?

: তোমরা কেউ চেন 'কুচ বরণ কন্যা যার মেঘ বরণ চুল', তোমরা কেউ দেখেচ তাঁকে যিনি বাঙ্গালী মেম সাহেবা, যিনি ত্রিবর্ণ লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা হস্তে সম্প্রতি কলকাতা থেকে সদলবলে এসেছেন ?

: লোকে কি বল্লে ?

: চাষী মজুর সশ্রদ্ধভাবে মাথা নত করে বললে, ও জনমাতা ! তিনি ত' ওই আশ্রমে বাস করচেন ।

: কুঁড়ে বাড়িটা আশ্রম হয়ে উঠল সুমিত বাবু ! আর কেউ কিছু বল্‌লে না ?

: বলেচে ! যারা এখানকার সমাজের গন্যমান্য লোক তারা বলেচে আপনি ভীষণ নারী ! আপনি মানুষ খুন করতে পারেন, আপনার নেতৃত্বে আপনাদের দলটা ডাকাতি করে, দাঙ্গা করে। আপনারা নাকি কিছুকাল পূর্ব্বেও সন্ত্রাসবাদী ছিলেন ।

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, এত খবর এত তাড়াতাড়ি পেলেন কি করে ?

: বাঙ্গালী জাত পঞ্চমুখে পরনিন্দা করতে পারে তা' ভুলে যাচ্ছেন কেন ? শুনলুম আপনি নাকি রাইফেল চালাতে পারেন, দুই হাতে রিভলবার ছুড়তে পারেন, তরবারি, ছোরা ত' আপনার নিকট সামান্য ব্যাপার ! আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন, মোটর গাড়ি চালাতে পারেন, এমন কি এরোপ্লেনও চালাতে পারেন ! সত্যি আপনি এরোপ্লেন চালাতে পারেন ?

: পারি ।

: কোথায় শিখলেন ?

: রাশিয়াতে ।

: রাশিয়াতে কি আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন ?

: হ্যাঁ, এ কথা আপনি কোথায় শুনলেন ?

: কাল আপনার সম্বন্ধে কথা উঠেছিল তখন একজন বললেন যে সুন্দরবনে আপনাদের গোলাগুলি, বোমা তৈরী করবার একটা কারখানা ছিল। ডাকাতি করে আপনারা বহু অর্থ সংগ্রহ করে বহু অস্ত্রশস্ত্র কিনে রেখেছিলেন। আপনার যদিও তখন পনের ষোল বছর বয়স ছিল, তবুও আপনি একজন নেত্রী ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম ধ্বংস করবার যেদিন সঙ্কল্প ছিল তার ঠিক দু'দিন পূর্ব্বে একজন বিশ্বাসঘাতকের নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ আক্রমণ করে। দুই দলে হয় প্রবল সংগ্রাম এবং দুই পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। শেষ পর্য্যন্ত আপনারা হেরে যান। পুলিশ আপনাদের সব্বাইকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু আপনাকে, চিত্রাদেবী, বিজন, অটলবিহারী ও অপর এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কোন সুড়ুঙ্গের মধ্য দিয়ে যে আপনারা পালিয়ে যান তা কেউ বুঝতে পারেনি। আজও পর্য্যন্ত চিত্রাদেবী ও বিজন বাবুর সন্ধান মেলেনি!

সীমন্তী হাসিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না।

সুমিত বলিল, চিত্রাদেবী ও বিজন বাবু এখন কোথায় আছেন?

: তার উত্তর ত' আমার নিকট পাবেন না।

: ওরা কি আপনার সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন?

: না।

: আপনার য়্যাডভেনচার্স-জীবনী আমায় শোনাবেন? কৌতুহলে আমার চোখে ঘুম আসেনি। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত আপনার কথা কেবল ভেবেচি।

তোমার এখনও হয়নি ছোড়দি' বলিতে বলিতে আশীষ ভিতরে

প্রবেশ করিয়া সুমিতকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে আপনকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, ছোড়দি একটু তাড়াতাড়ি করে প্রস্তুত হয়ে নাও ভাই! এখন না বেরুলে দুপুরের আগে পৌঁছতে পারা যাবে না।

সীমন্তী বলিল, আমার আর বিশেষ দেরী নেই। চারটি খেয়ে এখুনি আসছি।

ঃ এখনও খাওনি? আমার যে ভাত হজম হ'য়ে গেল!

সীমন্তী একটু হাসিল। সুমিতকে বলিল, আপনাদের মধ্যে বুঝি পরিচয় নেই। মধুপুরেই আশীষের বাড়ি। এবার বি-এ পাশ করেচে। নিখিলভারত সমাজতন্ত্রীদলের একজন অকৃত্রিম সদস্য।—আর আশীষ! ইনি হচ্ছেন,—

আশীষ বলিল, আমি সুমিত বাবুকে ভাল করেই চিনি। এম, এস-সি পাশ করে বছর দুই লণ্ডনে ছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরেচেন, রাশিয়ায় যাবার সঙ্কল্প আঁটচেন।

সুমিত বলিল, আপনি যে গড়গড় করে আমার সব কথা বলে গেলেন। আমি অনেকদিন দেশে ছিলুম না, তারপর দিনরাত য়্যাসিড্ ফ্যাসিড্ নিয়ে পড়ে থাকি, দেশের খবর বিশেষ রাখিনা। অনুরোধ, অপরাধ নেবেন না যেন।

আশীষ বলিল, অনুরোধ কি বলচেন, আপনারা অর্থাৎ জমিদার ও ধনিক শ্রেণী যদি নিরপেক্ষ থাকেন তবেই আমাদের অনেক কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে যাবে।

সীমন্তী বলিল, তোমরা ভাই আলাপ পরিচয় কর, আমি ইত্যবসরে খেয়ে আসি।

আশীষ বলিল, আমিও যে খাব।

: তুই না এই মাত্তর খেয়ে এলি।

: তোমার পেসাদ খাব ছোড়দি।

সুমিত প্রশ্ন করিল, আপনারা কি কোথাও যাচ্ছেন?

আশীষ বলিল, সুনামগঞ্জে একটা কিষাণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিরাট এক সভা হবে, যাবেন আপনি?

: সভায় কি হবে?

: কিষাণ নেতারা বক্তৃতা করবেন, ছোড়দি হবে সভাপতি। ছোড়দির বক্তৃতা শুনেননি? চমৎকার বক্তৃতা করতে পারে। ইংরেজীতে যখন বক্তৃতা করেন তখন বুঝতে পারবেন না যে বাঙ্গালী মহিলা বক্তৃতা করচে—ঠিক ইংরেজ মহিলার মত বক্তৃতা করে।

সীমন্তী বলিল, ইংরেজ মহিলার আর দুর্ণাম করতে হবে না, খাবি ত' চল। সুমিত বাবু কি ওর ভাঁওতায় পড়ে সভায় যাচ্ছেন নাকি?

সুমিত বলিল, আজ যেতে পারব না, তবে একদিন নিশ্চয়ই যাব। আর আপনাদের দেরী করাব না। আজ আসি—নমস্কার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কংস নদীর তীরেই জমিদার বাড়ি। বৃহৎ রাজবাড়ি ঘিরিয়া প্রশস্ত এক দেওয়াল। রাজপ্রাসাদ, অন্দরমহল, নাটমন্দির, বিলাসকুঞ্জ, তপোবন, ফুলের ও ফলের বাগান প্রভৃতির সমন্বয় আধুনিক চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করে। রাজবাড়ির পাশেই কাছারী, অতিথখানা, উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, খেলার মাঠ প্রভৃতি।

সাতপুরুষের জমিদারী। প্রথম পুরুষ জমিদারীর গোড়া পত্তন করিয়া যান। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া জমিদারীটি সুসজ্জিত করেন এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করেন শুধু বিলাস। বিলাসের প্রতিক্রিয়ায় শ্রীবৃদ্ধির অগ্রগতিতে ধরিয়াছে ভাঙ্গন। বর্ত্তমান জমিদার রাজনারায়ণ বসুর আমলে সুদীর্ঘ পতনের বিরাট দৃশ্যটাই লোকের চোখে প্রথম পড়ে। জমিদারীতে মিল ফ্যাক্টরী স্থাপনের পর হইতেই যেন জমিদার বংশের পতন দ্রুত আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বেই লক্ষ্মীশ্রী তিরোহিত হইতেছিল কিন্তু প্রতিপত্তি হ্রাস পায় নাই। পতন হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই জমিদার রাজনারায়ণ পল্লীর বুকে ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবার জন্য কৃষি জমি মাড়য়ারীর নিকট বিক্রয় করেন। ফ্যাক্টরীতে তাহার কিছু অংশও আছে। টাকার লোভে চাষীদের সর্ব্বনাশ করায় যন্ত্রদেবতা জমিদারের পৈত্রিক ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ প্রতিপত্তি হ্রাস করিয়া লইতেছেন।

কংসনদীর তীরে

দেড় মাইল আয়তনের রাজবাড়ি, বাগান বাড়ি, কাছারি মহল। রাজবাড়ির তিন দিকেই পল্লীগ্রাম। পশ্চিম দিকে সুপ্রাচীন কংসনদী। রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে চিনির কল ও চট কল। কলের দুই পাশেই কুলির বস্তি এবং নদী সৈকতের উপরে মিল কোয়াটার।

•

সুমিত অনেকক্ষণ যাবৎ স্নানাগারে ঢুকিয়াছে। সুমিতের ছোট বোন সুলেখা একবার তাড়া দিয়াছিল তবু সুমিতের বাহির হইবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া সুলেখা কড়া ধরিয়া জোরে নাড়া দিতে আরম্ভ করিল।

সুমিত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। অনুযোগ করিয়া বলিল, একটু আরাম করে চান করব তার উপায় নেই।

সুলেখা বলিল, কখন চান করতে ঢুকেছ মনে আছে? শীতের দিনে বাবু পারতপক্ষে ওদিকে ঘেঁসেন না, আর যত চানের ধুম পড়ে গরমের দিনে। চা জুড়িয়ে গেল, চল তাড়াতাড়ি করে।

সুমিত পাঞ্জাবীর বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিল, চল!

সুলেখা বলিল, এ আবার কি সখ! মাগো, খোল বলচি?

: কি হল এটাতে?

: এই গরমে কেউ এত মোটা জামা গায়ে পরে? বিলাত থেকে ঘুরে এলে অথচ তুমি যেমন হাবা মার্কা ছিলে তেমনিই আছ। স্মার্ট আর হতে পারলে না?

: বিলিতি জিনিষ আর আমি ব্যবহার করবনা প্রতিজ্ঞা করেচি।

: মানে ?

: দেশী জিনিষ ব্যবহার করব !

: সেজন্যেই বুঝি এই বাক্সে কাপড়গুলি পড়চ ?

: হ্যাঁ !

: তোমার মন্ত্রগুরু কে ?

সুমিত খাবার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, আমার মন আমার বিবেক ও বুদ্ধি !

: হঠাৎ এ পরিবর্তনটা কে এনে দিল শুনি ?

: যিনিই এনে দিন না কেন, যা এসেছে তা মঙ্গল কিনা তাই আমাদের বিচার করে দেখা উচিত !

: তুমি যে আমায় অবাক করচ দাদা !

: আমি নিজেই কি কম অবাক হয়েচি ! এতখানি বয়স হল, লেখাপড়া কিছু শিখেচি অথচ মনুষ্যত্ব লাভ করিনি এক তিলও !

: তুমি ক্ষেপলে নাকি শেষটায় !

: ভয় নেই ! এই কথাটা মনে রাখিস যারা পরাধীন ওদের মনুষ্যত্ব বলে কোন জিনিষ ভগবান দেন নি ! যারা নিজের ও দশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করে ভগবান তাদের আশীর্ব্বাদ করেন। পরাধীন জাতি মনুষ্যত্ব লাভ করে না, তাদেরকে অর্জ্জন করে নিতে হয় !

সুমিত ও সুলেখা চায়ের টেবিলে আসিয়া বসিল।

সুলেখা প্রশ্ন করিল, তুমি কি কংগ্রেসের সদস্য হয়েচ নাকি ?

: না ! তবে শীঘ্রই কংগ্রেস দলভুক্ত হয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করব !

সুলেখা শঙ্কিত ভাবে বলিল, যা সন্দেহ করেছিলুম! তোমার মাথা খারাপ হয়েচে। সাবধান ও কথা আর মুখে এনোনা, বাবার কানে গেলে আর রক্ষা নেই!

: আমি নিরুপায় সুলেখা! অনেক বার ভেবেছি, ভেবে দেখলুম সত্য ও মনুষ্যত্ব সবার উপরে। ভেবেছিলুম কাউকে কিছু বলব না, জানবার যখন তখন আপনি জানবে। কথাটা যখন উঠে পড়েছে তোকে বলব।

সুলেখা নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিল।

সুমিত বলিয়া চলিল, আমি যা করতে চলেচি তাতে বাবাকে খুব বড় আঘাত দেওয়া হবে কিন্তু উপায় যে নেই। জাতীয় স্বাধীনতার যুপকাষ্ঠে আমি দাঁড়াব। দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচারের জন্য ভাবিনে, যদি কারাবরণ করতে হয় তবে বাবা খুব দুঃখিত হবেন।

: বাবাকে দুঃখ দেওয়া কি তোমার উচিত হবে দাদা?

: শুধু দুঃখ হলে তবু কথা ছিল, আমাকে যে নিজের হাতে আঘাত দিতে হবে। আমাকেই বংশগত অর্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। স্বার্থান্বেষী ধনতন্ত্রবাদীদের অন্যায় অবিচারে এই জমিদারী রচিত হয়েচে। এই বিরাট সৃষ্টির পশ্চাতে যেমন বিরাট শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে, তেমনি আবার এর মাঝে ওতপ্রোত ভাবে ছড়িয়ে আছে সর্ব্বহারাদের দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণিবার্ত্তা, আছে নির্য্যাতীত ও বঞ্চিতদের চোখের জলে তৈরি গভীর

মহাসমুদ্র। আর আছে সমুদ্রতীরে পাপের গগনস্পর্শী পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপ।

সুলেখা শঙ্কিতভাবে বলিল, দাদা তুমি বলচ কি ?

: আজ যা বলচি, আজ যা আমি উপলব্ধি করচি তা একদিনের কথা নয়, বহু কালের পুরাতন কথা। পরনির্ভরশীল হয়ে মানুষ হয়েচি—দুর্ব্বল আমি, ঐশ্বর্য্য, বিলাস ও আভিজাত্যের পীড়নে আমি পঙ্গু হয়ে গেছি, কিন্তু চিরকাল ত' এ দোহাই দিয়ে চলতে পারে না। আমি যে মানুষ তার ত' একটা পরিচয় চাই !

: তুমি যে ক্রমশ হেঁয়ালী হয়ে উঠলে দাদা !

: হেঁয়ালী নয় লেখা ! যেদিন বুঝতে পারবি যে পূর্ব্বপুরুষের কৃত-অপরাধের দেনা আমাদেরই সুদে আসলে শোধ করতে হবে তখন দেখবি আমি যা বলেছি তা অতি সাধারণ কথা !

: সীমন্তী তোমায় প্ররোচিত করেচে না ? তুমি বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রজা আন্দোলন করবে ? সীমন্তী তোমায় শিখিয়েচে বাবার জমিদারীটা ধ্বংস করবার জন্যে ?

: তিনি ত' আমায় কোন কার্য্যে প্ররোচিত করেন নি, এমন কি কংগ্রেসে যোগ দিতেও বলেন নি !

: তবে তোমার মাথায় এ দুর্বুদ্ধি কে ঢোকালে ?

: ওঁর উপর মিথ্যে আক্রোশ করচিস। সীমন্তী দেবী তোর আমার মত সাধারণ নন। ওঁর স্নিগ্ধ গভীর চাহনিই আমায় সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, ওঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে আমি মুগ্ধ হই, ওঁর সঙ্গ

আমার প্রাণে আলোড়ন তোলে, ওঁর ত্যাগী জীবন আমায় বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে আমায় ত্যাগের পথে চালিত করে।

: আর গুণ কীর্ত্তন ক'রে তোমার দুর্ব্বলতা ও মোহের পরিচয় দিও না।

: লেখা! তোরা ওঁকে শত্রু মনে করিস, কিন্তু তিনি সত্য সত্যই কারও শত্রু নন। যদি তুই ওঁর পাশে একবার দাঁড়িয়ে চোখে চোখে চাস তবে উপলব্ধি করতে পারবি কেন মানুষ তাঁকে ভালবাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, কেন তাকে জনমাতা বলে ডাকে।

: একটা সত্যি কথা বলবে?

: মিথ্যা কথাত' আমি বলিনে!

: সীমন্তীকে তুমি ভালবাস?

: ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি।

: থাক, অত আর বলতে হবে না। মেয়েটির রূপ যৌবন দুইই আছে, দম্ভ করা চলে

: মানে?

: তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও!

: বিয়ে—তোর কি মাথা খারাপ! ইনি বোমার যুগের নারী! ইনি সেই ধরণের মানুষ, যাঁরা বিয়ের আসন ছেড়ে চলে যায় সমর ক্ষেত্রে, দেশের জন্যে হাসি মুখে প্রাণ ত্যাগ করে। সীমন্তী দেবীকে চিনবার শক্তি তোর আজও হয়নি, আমিও সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারিনি।

: আমার চেনবার দরকার নেই। তোমাকে অনুরোধ করচি, ওঁদের সঙ্গে আর তুমি মিশনা।

: অন্যায় অনুরোধ রাখতে আমি পারিনে।

হঠাৎ রাজনারায়ণ বাবুর গলার আওয়াজ পাইয়া সুমিত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

সুমিত বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সীমন্তীর বাড়িতে আসিল। সীমন্তী বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার পাতিয়া একখানি পত্রিকা পড়িতেছিল, সুমিত আসিতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আসুন!

: নমস্কার! জনমাতার জয় হোক!

সুমিতের কথা বলিবার ঢঙ্গে সীমন্তী হাসিয়া বলিল, হঠাৎ জনমাতা কি অপরাধ করলেন?

সুমিত একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল, অপরাধ গুরুতর। তিনি জমিদার বংশের ভাঙ্গন ধরিয়েছেন।

: ভাঙ্গন যেদিন সত্য সত্যই হবে সেদিন বুঝব আমার কাজ অনেক দূর এগুলো এবং যেদিন সব ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়তে পারব সেদিন এখানকার কাজ আমার শেষ হবে।

: ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়তে পারবেন কিনা বলতে পারিনে কারণ পাহাড় ভাঙ্গা যায় কিন্তু গড়া যায় না।

: এ কথা ভুললে চলবে না সুমিত বাবু, যে আমি কংগ্রেস সেবিকা। যদি সব ভেঙ্গে চুরে নতুন করে না গড়তে পারি তবে কংগ্রেস মিথ্যে হবে, আমার অকৃত্রিম সেবা ব্যর্থ হবে। কংগ্রেস যদি সত্য হয় আর আমার সেবা যদি অকৃত্রিম হয় তবে জীবনপাত

হতে পারে জয়ের ভিত্তি রচনা করবার জন্যে কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি পড়বে না।

: অকৃত্রিম হলেই কি সব কিছু হয়? দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুঝতে যুঝতে দেশবন্ধু, লোকমান্য প্রভৃতির মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু—

: ভারত স্বাধীন হয়নি এই ত'? কংগ্রেস মিথ্যে নয় এবং ওঁদের অকৃত্রিম সেবা ও কাজও মিথ্যে নয়, ব্যর্থ কিছু হয়নি সুমিত বাবু! দেশের জন্য যে যেভাবে সত্যকে আশ্রয় করে কাজ করে গেচেন তাই মূলধন হয়ে আছে। ডোবার উপর দালান স্থাপন করবার পুর্ব্বে ডোবাটা ভরাট করতে হয় এবং লম্বা লম্বা কাঠ ঠুকতে ঠুকতে মাটির নীচে বসাতে হয়। তারপর ভিত্তি গড়ে দালান করতে হয়। তেমনি হাজার বৎসরের জমাট বাঁধা পাপ দূর করে ভিত্তি রচনা করবার জন্য বহু মহাপুরুষের জীবন উৎসর্গ করতে হচ্ছে।

: সে কথা সত্যি! যুগ যুগ ব্যাপী যে পাপ জমা হচ্ছে তার জন্য মহাপুরুষদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এই প্রায়শ্চিত্তই হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের asset.

: চা খাবেন?

: না, আমি খানিক আগে খেয়ে এসেচি।

: জল ফুটচে, নিজের জন্য চা করতে হবে, করব দু' কাপ?

: করুন! তৈরী চা খেতে আমার আপত্তি নাই।

সীমন্তী ষ্টোবটা নিবাইয়া গরম জলের কেতলীটা নামাইয়া লইল। টি-পটে গরম জল ঢালিতে ঢালিতে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কাল মিটিংয়ে সত্য সত্যই যাবেন?

: নিশ্চয় যাব! প্রধানত আপনার বক্তৃতা শোনা, দ্বিতীয়ত আমি দেশ সেবা করব!

: দেশ সেবা কিন্তু সোজা কাজ নয়! পাহাড়ে বসে তপস্যা করা সহজ, আগুনের মধ্যে বসে ভগবানের ধ্যান করা সহজ কিন্তু অকৃত্রিম কংগ্রেস কর্ম্মী হওয়া সহজ নয়।

: আমায় যথেষ্ট পরীক্ষা করেচেন, তবু কেন আর সন্দেহ করেন? এবার আপনাদের পাশে স্থান দিন, আমাকে খাটিয়ে কাজ হাসিল করে নিন! আমি কিন্তু কূট রাজনীতিজ্ঞ নই এবং বুদ্ধি খেলে কিছু করতে পারিনে। তবে কারও নির্দ্দেশ মত গাধার মত খাটতে পারি!

: জেলে যেতে পারবেন? প্রয়োজন হলে আপনাকে প্রজার পদ সেবা করতে হবে, তা পারবেন আপনি?

: ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বা কারও প্ররোচনায় আমি আসিনি সুতরাং এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। প্রথম প্রথম হয়ত অনেক কিছু পারব না কিন্তু আপনি যদি সত্য হন তবে কেন একদিন সকল সমস্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারব না? যদি না পারি উত্তীর্ণ হতে তবে বুঝব আপনার ক্ষমতা সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। জানেন? আশীষবাবু আমায় কংগ্রেস সদস্য করবে বলে কথা দিয়েচে!

সীমন্তী কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে চা বানাইতে লাগিল। খানিক পরে সীমন্তী প্রশ্ন করিল, আপনি কত চামচ চিনি খান?

: সরবৎ খেতে ভালবাসি।

সীমন্তী চার চামচ চিনি দিয়া আরও এক চামচ চিনি দিতে গেলেই সুমিত বলিল, সিরাপ করবেন না তা' বলে?

সীমন্তী নিজে এক কাপ চা লইয়া অন্য কাপটি সুমিতকে দিল।

সুমিত প্রশ্ন করিল, আপনার অতীত জীবনের প্রতি আমার এত বেশী কৌতূহল অথচ আপনার মুখ থেকে কোন কথাই শুনতে পেলুম না। আপনি কি আমায় বিশ্বাস করেন না?

সীমন্তী বলিল, সন্ত্রাসবাদের প্রতি আমার আর আস্থা নেই, সত্য এবং অহিংসাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। সত্য এবং অহিংসাকেই আশ্রয় করে আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। অতীত জীবন তুলে লাভ কি বলুন?

ঃ নারী জাতি যে এত কঠিন এত দৃঢ় এত বড় শক্তিশালিনী হতে পারে তা যেন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না সীমন্তী দেবী।

ঃ দেবী চৌধুরাণী কি আমাদের দেশে ছিলেন না?

ঃ যুগধর্ম্মকে ত' বিবেচনা করতে হবে? লক্ষ লক্ষ কুটিল ভয়ঙ্কর চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে, আপনি দুর্গম শৈলশিখর, কান্তার মরু, দুস্তর বনানী অতিক্রম করে অন্তর্ধান করেচেন এ কথা যে বিশ্বাস হতে চায় না!

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, জীবনের ভয়ে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে।

সুমিত বলিল, জীবনের ভয় আমাদের, আপনার নয়। জীবনের মায়ায় আমরা জীবনকে রক্ষা করি, আর আপনারা জীবন রক্ষা করে চলেন কর্ম্মসূচী সমাপনের জন্যে।

সীমন্তী বলিল, আপনি যে দেশের কাজ করতে নামচেন, দেশের

কাজ কি সে সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান আছে?

: আপনার সঙ্গে যদি আমার ঘনিষ্টতা না হ'ত তবে বলতুম যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিন্তু এখন বলতে পারি না। শুধু এ কথা বলতে পারি যে, মানুষের অকৃত্রিম সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না! এবং মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে যা প্রত্যেক মানুষকেই মানুষ বলে পরিচিত করতে পারে, যার জন্য প্রত্যেক মানুষই দাবী করতে পারে সবার চেয়ে বড় বলে। সেই গুণাবলী কারও প্রকাশ পায় কারও পায় না। গুণাবলী প্রকাশ পায় না বলেই ত' মানুষই মানুষের শিক্ষাগুরু হয়।

সীমন্তী হঠাৎ আলোচনায় বাধা দিয়া বলিল, এক্ষুনি বেরুতে হবে আমায়!

: কোথায়?

: আলতাফ মিঞার বাড়িতে!

: মিটিং আছে নাকি?

: ঘরোয়া বৈঠক হবে। যাবেন আপনি?

: আমাকে নিতে কোন আপত্তি নেই ত?

: না!

: চলুন তবে!

সীমন্তী ঘরে তালা লাগাইয়া একটা টর্চ-লাইট লইয়া আলতাফ মিঞার বাড়ির দিকে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীমন্তী ও সুমিত যখন আলতাফ মিঞার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চটকলে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়াছে।

আলতাফদের বাড়িতে যাইবার পায়ে হাঁটা সরু পথটার মোড়ে কদম গাছটার নীচে দাঁড়াইয়া সীমন্তী বলিল, সুমিতবাবু, প্রজার বাড়ীতে যেতে মর্য্যাদাহানি হচ্চে না ত' ?

: মর্য্যাদাহানি কেন হবে ?

: আপনি জমিদারতনয় আর আলতাফ মিঞা প্রজা, বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মর্য্যাদাহানি হয় বৈকি !

: সঙ্গে আপনি'ত আছেন—আপনার মত শিক্ষিতা, পদমর্য্যাদাশালিনী একজন দলনেত্রী সঙ্গে থাকলে মর্য্যাদা বাড়বে বই কমবেনা।

: কিন্তু আমি ত' জমিদার-কন্যা বা জমিদার-পত্নী নই !

: কিন্তু মানুষ ত' ! আপনি কি আমায় এতই কাপুরুষ বলে মনে করেন যে, যেখানে আপনার স্থান হয় সেখানে আমার স্থান হবেনা। আপনি আমায় যত ঠাট্টা করুন না কেন আমি লোকের ন্যায্য সম্মান দিতে কখনও কার্পণ্য করব না—এরূপ হীন কাপুরুষতা আমার নেই।

গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। নদীর পারে মিল কোয়া-টারের সারি সারি গৃহগুলির আলোগুলি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

মিলের ঘস্ ঘস্ ঘাপসা শব্দ চারিদিকে ক্লান্ত হইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। সীমন্তী ও সুমিত আলতাফের বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল।

আলতাফ মিঞার পিতা আক্রাম মিঞা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। চাষ-আবাদ করিয়া প্রায় তাহার দুই শত মন ধান ও দেড় শত মন পাট হয়। হাল চাষ ব্যতীত তেজারতি বসা আছে। লোকমুখে গুজব আক্রাম মিঞার হাতে না-কি নগদ ২৫ হাজার টাকা আছে এবং ৩০হাজার টাকা সুদে খাটিতেছে। জমিদার রাজনারায়ণ বাবুও বিপদে আপদে আক্রাম মিঞার নিকট হইতে টাকা ধার করেন।

আক্রাম মিঞা বৃদ্ধ হইয়াছেন, এত বার্দ্ধক্যে আর লাঙ্গল ধরিতে পারেন না এবং এত বড় গৃহস্থও তেজারতি ব্যবসায় একা একা চালাইতে পারেন না। নিজে লেখাপড়া জানেন না বলিয়া তেজারতির হিসাব পত্র রাখিবার ভার পুত্রের উপর দিয়াছিলেন; কিন্তু আলতাফ এই শোষণ কার্য্যে সাহায্য করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। আলতাফ গিরস্থি ও তেজারতি ব্যবসায় সাহায্য করিতে অপারগ হওয়ায় আক্রাম মিঞা পুত্রের উপর ভীষণ চটিয়া যান। এই লইয়া পিতাপুত্রে বহুবার বাদানুবাদও হইয়াছে।...

আলতাফ যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে তখন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত আন্দোলন প্রধান প্রধান সহর ছাড়িয়া ছোট ছোট সহরে ছড়াইয়া পড়ে এবং ছোট ছোট সহর হইতে পল্লীতে পল্লীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ বন্যার স্রোতের ন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। থানায় থানায়, গ্রামে

গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত, ছাত্রদল, কেরাণীদল স্কুল আপিস বর্জ্জন করিয়া অগ্নিশিখারূপে আকৃষ্ট পতঙ্গ দলের মত কংগ্রেসের প্রশস্ত বাহুতে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। কংগ্রেসকর্ম্মিগণ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য করে। হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে প্রত্যেকটি লোক থমকিয়া দাঁড়াইত সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীর পদতল লাঞ্ছিতা মাতৃভূমির কণ্টকাকীর্ণ শৃঙ্খল মুক্ত করিবার আহ্বানে নির্জীব জড়পল্লীবাসীর প্রাণও সাড়া দিয়া উঠিত—স্তিমিত ধমনীর প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুক্তি সংগ্রামের প্রবল আকাঙ্খা স্ফুরিত হইত। চাষী মজুর আত্মবিশ্বাসী নয়, নিজের শক্তির প্রতি অভিজ্ঞ নয় বলিয়া মুক্তি সংগ্রামে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। যে শক্তি নিয়া ছাত্রদল ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কংগ্রেস সেবিগণ নিরক্ষর পল্লী-বাসীর মনুষ্যত্বে আঘাত করিয়াছিল তাহাতে আত্ম-শক্তিহীন চাষী-মজুর জাগরিত হইতে পারে না। ছাত্রদল ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত কংগ্রেস সেবিদের ক্ষুদ্র শক্তি সামান্য আঘাতেই নিঃশেষ হইয়া যায়—ক্ষুদ্র শক্তি নিয়াই বার বার আঘাত করিবার অবকাশ তাহারা পায় নাই, এমনকি কোন শক্তিশালী দেশ-কর্ম্মীও প্রচণ্ড আঘাত দ্বারা চাষী মজুরদের চেতনা প্রাপ্ত দেশাত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তিকেও সঞ্জীবিত করিয়া তুলে নাই।...

আলতাফ কংগ্রেসে যোগদান করে। খাটিবার অসীম শক্তি ছিল বলিয়া স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়। আলতাফ যতদিন কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিল ততদিন সে আন্তরিকতার

সহিত কাজ করিয়াছে। কংগ্রেসের প্রসার ও উন্নতির জন্য সে এত বেশী পরিশ্রম করিত যে, লোকে তাহাকে বলিত আলতাফ গাধার মত খাটিতে পারে। কিছুকালের মধ্যেই আলতাফের নাম চারিদিকে প্রতিভাত হইয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে গ্রেপ্তারের হিরিক পড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামের নেতাগণও বাদ পড়িলেন না। আইন অমান্য করিবার অপরাধে আলতাফের দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। আক্রাম মিঞা পুত্রকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আলতাফ পুলিশ হাজতের অপরিসীম কষ্টে অতিষ্ঠ হইয়াও মুক্তি কামনা করিল না। অপরাধ স্বীকার করিয়া যদি সে প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিত যে, সে আর কখনও মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করিবে না, তবে তাহার জেল হইত না; এমন কি সরকারী চাকরী পাওয়ারও আশা ছিল। আলতাফ কারাবাস বরণ কবিল কিন্তু প্রলোভনে সঙ্কল্পচ্যুত হইল না।

দেড় বৎসর পর আলতাফ জেল হইতে ফিরিয়া আসে এবং কিছু-কাল বসিয়া থাকিবার পর সন্ত্রাসবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়। এই দলটি দেশকে ভালবাসে, দেশের স্বাধীনতা উগ্রভাবে কামনা করে। এরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করে নিজের নাম গোপন করিয়া সংগ্রামের পরিবর্ত্তে নাম চায় না, যশ চায় না, সম্মান চায় না গোপনে কাজ করিয়া যায় এবং লোক-চক্ষুর অন্তরালেই স্বাধীনতা সংগ্রাম করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কত দুর্গম গিরি-প্রান্তর, কত ভয়াবহ বন-জঙ্গল, কত ভীষণ নদ-নদী দিনের পর দিন রাত্রির পর

রাত্রি অতিক্রম করিয়া চলে—মৃত্যু নিয়া এরা খেলা করে। জীবন দান ও জীবন গ্রহণই এদের চরম লক্ষ্য—এই নরহত্যার খেলায় যেন তাহারা রোমাঞ্চ পায়।...

গুপ্ত দলের কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইতেই আলতাফ ধরা পড়ে। বিভিন্ন আইনের প্যাঁচে আলতাফের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং কারাদণ্ডের অব্যাহতি পরেই তাহাকে রাজবন্দী করা হয়।

আলতাফ রাজবন্দীর নাগপাশ হইতে বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়া দেশ প্রত্যাগমন করে এবং সকল কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লেখাপড়ায় মন দেয়। আলতাফ নির্ব্বিকারের মত গৃহের কোণ আশ্রয় করায় পিতাপুত্রের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কমিয়া যাইতে লাগিল।

পিতাপুত্রের সম্বন্ধ যখন স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে এমনি সময়ে ভারত ব্যাপিয়া কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলন জাগিয়া উঠিল এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক মাদ্রাজ, বোম্বাই, সীমান্ত প্রভৃতি প্রদেশে মন্ত্রী গ্রহণের ফলে অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল।

আলতাফ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সীমন্তী দেবীর নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করিল। কৃষক আন্দোলনে যোগদান করায় জমিদার রাজনারায়ণ বাবুর ক্রোধানলে সে পতিত হয়। জমিদার আক্রাম মিঞাকে ডাকাইয়া সতর্ক করিয়া দেন। আক্রাম মিঞা জমিদারের কৃপাতেই এতবড় হইয়াছেন, সুতরাং তিনি সমাজতন্ত্রী পুত্রকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি নিজেও বিত্তশালী ব্যক্তি।

বিধবা কন্যা ফুলকোয়ারা প্রতিবন্ধকতা করায় আক্রাম মিঞা এখনও পুত্রকে ত্যাজ্য করিতে পারেন নাই। তবে পুত্রকে ত্যাজ্য করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন!

সীমন্তীর অপেক্ষায় আলতাফ ও ফুলকোয়ারা বসিয়াছিল। সীমন্তীর আগমনের সাড়া পাইয়া দুইজনেই ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সীমন্তীর সঙ্গে অপর এক ভদ্রলোককে দেখিয়া ফুলকোয়ারা দাঁড়াইয়া পড়িল।

সীমন্তী বলিল, ইনি ভাবী জমিদার শ্রীযুক্ত সুমিতকুমার বসু।

আলতাফ হাত তুলিয়া দুইজনকে নমস্কার করিয়া বলিল, আসুন, আপনাদের চরণ ধূলায় আমাদের কুটির পবিত্র হ'ল।

ফুলকোয়ারা কোনকথা না বলিয়া সীমন্তীকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

সীমন্তী ফুলকোয়ারার নিকট গিয়া হাত ধরিয়া বলিল, ওকে লজ্জা ক'রোনা বোন, ভারি ভাল মানুষ! উনি সচ্চরিত্র ও খুব বিদ্বান ব্যক্তি। আশীষের সঙ্গে যেমন কথা বলতে সঙ্কোচ করোনা তেমনি ওঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলতে পারো।

ফুলকোয়ারা স্নিগ্ধ মৃদু হাস্যে সুমিতকে নমস্কার করিল। আস্তে আস্তে বলিল, উনি আমার নিকট অপরিচিত নন।

সুমিত সীমন্তীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

ছোট্ট ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্দর মহলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সীমন্তী ও সুমিতকে চেয়ারে বসাইয়া আলতাফ একটা নীচু মোড়া টানিয়া

বসিল। ফুলকোয়ারা লজ্জাবশতঃ বসিতে পারিল না, আধ ঘোমটায় এক পাশে দাড়াইয়া রহিল।

সীমন্তী বলিল, তুমি ভাই ফুল বসলে না। তোমার নিমন্ত্রনেই যে এলুম!

ফুলকোয়ারা বলিল, তা না হলে বুঝি বোনের বাড়ী আসতে হয়না!

সীমন্তী উঠিয়া ফুলকোয়ারার গাল টিপিয়া দিয়া সস্নেহে বলিল, অভিমান আছে।

: অভিমান হবেনা, সেই কবে এসেছিলেন, আর আসেন নি!

: তোমার বাবা যদি এমনি মাঝে মাঝে অনুপস্থিত হন্ তবে এ অভিযোগ করবার অবকাশ দেবনা তা' নিশ্চিত জেন! আমি ত' নিজের জন্য ডরাইনে, ডরাই তোমাদের জন্যে। দেখনা তোমাদের ভাবী জমিদার বাবুকে! ওঁর বাড়ী যাইনে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এম্নি কি শত্রুর গহ্বরে প্রবেশ করা যায়? সুযোগ খুজছি, সুবিধে পেলেই ঢুকব! বোমার যুগের মেয়ে আমি!

সীমন্তী আপন মনে হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মৃদু হাস্য করিল। আলতাফ বলিল, ছোট কর্ত্তা বাবুর সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হল। জানেন দিদি, কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল এককালে। দুজনে এক সঙ্গে বাকে খেলতুম। কর্ত্তাবাবু কতদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তারপর উনি পাশ করে শহরে চলে গেলেন, আমিও জেলেটেলে গেলুম— দীর্ঘকালের মধ্যে আর দেখা হয়নি দুজনের মধ্যে।

সুমিত বলিল, বিজ্ঞানের যন্ত্রাপাতি নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমিও যেন প্রাণহীন যন্ত্রপাতি হয়ে গেছি! মাঝে মাঝে বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে

যায়। সত্যি তখন কি ছিলুম আর এখন কি হয়েছি! আমি যে এককালে খেলতুম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হৈ করতুম, পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে, বনে জঙ্গলে, নদীতে ঘুরে বেড়াতুম, তা এখন কেউ আমায় দেখে বিশ্বাস করতে পারবে না! কলকাতায় মাঝে মাঝে কোকিলের ডাক শুনে এখনও থমকে পড়ি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমার মত নীরস মানুষেরও ভাবান্তর হয়।

ফুলকোয়ারার ইচ্ছা হয় সুমিতের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু কিসের সঙ্কোচ যেন তাহাকে বাধা দেয়। বারবার সুমিতের মুখের দিকে তাকায়, কেহ লক্ষ্য করিলেই চোখ নামাইয়া নেয়। সুমিতের প্রতি চাইতে গিয়া তাহার কাল চোখ দুইটি যেন আনন্দে নাচিয়া উঠে, মুখখানি রাঙা হইয়া পড়ে, বুকের মাঝেও যেন রক্তের রঙিন নাচন সুরু হইয়া যায়।

সীমন্তীর চক্ষু এড়াইলনা, খানিকক্ষণ ফুলকোয়ারাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, ও ভাই ফুল, তুমি যে নীরবে enjoy করে যাচ্ছ শুধু!

ফুলকোয়ারা তাড়াতাড়ি সুমিতের মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া নিল, সীমন্তীর নিকট ধরা পড়িয়া লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল টুকটুক হইয়া উঠিল।

সীমন্তী মৃদু হাস্যে বলিল, ফুলের সঙ্গে সুমিত বাবুর শৈশবে পরিচয় ছিল না?

সুমিত বলিল, খুব বেশী পরিচয় ছিল। ফুলকোয়ারা ওর বাবার সঙ্গে প্রায় রোজই আমাদের বাড়ীতে আসত। তখন আমার বোনের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল। ওর যখন বছর চৌদ্দপনের বয়স হবে তখন বি,এ পরীক্ষা দিয়ে অনেককাল পরে বাড়ী এসেছি। এসে দেখি হঠাৎ ফুলকোয়ারা যেন গোঁড়া মুছলমান হয়ে গেছে।

সুমিতের কথায় সকলেই উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুমিত বলিল, হাসির কথা নয়। আমার সঙ্গে কথা বলা ত' দূরের কথা, আমার দৃষ্টির বাইরে দিয়ে চলে। বোরখা ছাড়া কোথাও বের হয় না। মনে আছে ফুলকোয়ারা, একদিন কি অপ্রস্তুত হয়েছিলাম।

ফুলকোয়ারা মৃদুহাস্যে ঘাড় নাড়িল।

সুমিত বলিল, ফুলকোয়ারা বোরখা প'রে তার বান্ধবী অর্থাৎ সুলেখার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। সুলেখার ঘরে বসে ফুলকোয়ারা বোরখা খুলে গল্পগুজব, খেলাধুলা করচে এমনি সময় আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের ঘরে যাই। আমি কি অত জানতুম যে, তিনি গোঁড়া মুছলমান হয়েছেন। ফুলকোয়ারা ত' ছুটে গিয়ে বোরখার নিচে মুখ লুকাল। এই ফুলকোয়ারা কয়েক বছর পূর্ব্বেও আমায় আদর করে আম, জাম কত কি খাইয়ে ছিল—সত্যি তখন বড় অপমান বোধ করেছিলুম। লজ্জায় অপমানে ব্যর্থ ক্রোধে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

ফুলকোয়ারা বলিল, বাবার সামনে ও' বোরখা পরে। তবে আমি ওকে বোরখা পরতে দিই না। কুসংস্কার আমি মানিনা। বাবার সঙ্গে তর্ক ক'রে আর পারিনে, টাকা পয়সার জোর পাইনে নইলে সহরে চলে যেতুম দুই ভাইবোনে। বোনকে লেখাপড়া শিখাতুম। দেশের কাজ করে এবং বাকি সময়টায় সাহিত্যসেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিতুম।

আশীষ রাস্তা হইতে চেঁচাইয়া বলিল, আলতাফ কবি বাড়ি আছিস? ফুলকোয়ারা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

আশীষ ভিতরে ঢুকিয়া বলিল আপনারা এসে গেছেন। আমি দুঃখিত, একটু দেরী হয়ে গেল। সুরঞ্জন বাবুর জ্বর উঠেছে, নীতিন বাবু ওরা সম্ভবতঃ ট্রেণ ফেল করেচেন।

আলতাফ বলিল, তবে আজ মিটিং মুলতুবী থাক, কাল দুপুরে দিদির বাড়ীতেই যাব।

অন্য লোক আসে নাই বলিয়া ফুলকোয়ারা পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে আসিল।

আশীষ, বলিল এইযে বেগম সাহেবা। চা-টা খেতে দেবেন—না এমনি এমনি বিদায় করতে চান?

ফুলকোয়ারা বলিল, বাবু যেন বথে চড়ে এসেচেন!

আশীষ বলিল, আমি নয় পয়দালে এসেচি কিন্তু জমিদার বাবু ত' আছেন। মান্য অতিথির যোগ্য সম্মান হওয়া ত' উচিত। হাজার হলেও ত' তিনি জমিদাব!

ফুলকোয়ারা বলিল, কংগ্রেস সেবীদের জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী নেই বাবু! সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারেন। কংগ্রেসে জমিদার প্রজা এক। তবে তোমাকে দুখানা লুচি বেশিই দেব!

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

খানিকক্ষণ পরে ঝি চা ও খাবার লইয়া আসিল।

আশীষ বলিল, সমস্তই ফ্রুউটস্! ধর্ম্ম তবে বাঁচল দেখচি! ধন্যবাদ বেগম সাহেবা!

ফুলকোয়ারা স্থির দৃষ্টিতে আশীষের দিকে তাকাইয়া রহিল। সীমন্তী বলিল, এখনও তোমার কুসংস্কারটা যায়নি দেখচি আশীষ! আশীষ উত্তরে জানালে, আমার কুসংস্কার কখনও ছিলনা, এখনও

নাই। ও এমনিই বলছি!

আলতাফ কথার মাঝখানে জানাইল, না না, ওকথা নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নাই।

সীমন্তী বলিল, তা বটে, কিন্তু এটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া আমার দরকার যে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের জাতবিচার, ভেদাভেদ ভাবা পাপ বলে মনে করি।

চা পানের পর ঘণ্টা খানেক গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সীমন্তী, সুমিত ও আশীষ অধিক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া আলোচনা বন্ধ করিয়া গৃহ অভিমুখে রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুমিত খদ্দরের চাদরটা পণ্ডিত মালব্যজীর মত গলায় একটা প্যাঁচ দিয়া গলার তুই পাশ দিয়া ঝুলাইয়া দিল। দেয়ালে বসান দীর্ঘ আয়নাটার দিকে চাহিয়া অপাঙ্গে একবার নিজের চেহারাটা দেখিয়া নিল। খদ্দরের জামা কাপড়ে বেশ মানায় তাহাকে। তৃপ্তিতে যেন তাহার চোখ টলটল করিয়া উঠিল।

সুমিত সন্ধ্যার অলক্ষ্য ছায়া দিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিল। দূরে কলের বাঁশী শোনা যায়, ক্লান্ত শ্রান্ত শ্রমিকদের কথা মনে পড়িতেই সুমিতের সীমন্তীর কথা মনে পড়িয়া গেল। শ্রমিক মজুর চাষী নিয়ে সব ক্ষেপে গেছে, মধ্যবিত্তের জন্য ত' কেউ ভাবে না! মধ্যবিত্তরা আজ কোথায়; সুমিত কংসনদীর বাঁকে আসিয়া থামিয়া পড়িল। সত্যইত' মধ্যবিত্ত জাতি আজ কোথায়? মধ্যবিত্তদের সমস্যাটাই আজ তাহার কাণে কেবলই ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল।

সুমুখে স্বচ্ছ কংসনদীর অবিশ্রান্ত ধারা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাল্‌কা তরঙ্গের মসৃণগতি, উর্দ্ধে শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চাঁদ। নদীর একপাড়ে সারি সারি বস্তি, গ্রাম, প্রান্তর, বনবনানী, সবার উপরে মাথা উচু করিয়া আছে কলের মোটা চিমনী। হয়ত বা সবার উপরে যন্ত্রদেবতাই চরম সত্য! নদীর অপর পাড়ে দেখা যায় বালুকা তট, শুভ্র বালুকণাগুলি যেন জ্যোৎস্নালোকে চিক্‌চিক্‌ করিয়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বালুকা তটের পরে সান্ধ্যছায়ার

মায়াবৃত বন দূর হইতে মনে হয় ঐ বনটা জমাট বাঁধা অন্ধকার, হয়ত বা বর্ষণোন্মুখ মেঘ।

: নমস্কার কুমার বাহাদুর! হাসি হাসি মুখে সীমন্তী পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুমিতের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসিমুখেই প্রতি নমস্কার করিয়া বলিল, এযে দেখছি রীতিমত খাঁটি খদ্দর।

খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে খদ্দরের কাপড়চোপড় আনিয়েছি। খদ্দরের কাপড়ে বেশ মানায় আমায় না?

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, বয়সে যদি বড় হতুম তবে আপনাকে আমি আশীর্ব্বাদ করতুম। একটু থামিয়া বলিল, খদ্দর পরেচেন বলে বোন শাসন করেনি ত'? শেষটায় একটা অশান্তি সৃষ্টি না হয়—এমনই ত' লোকে বলছে ঘরের শত্রু বিভীষণ।

: জীবনে একটু কলঙ্ক থাকা ভাল, অলস মহূর্ত্তে বড় কাজ দেয়।

ফুর ফুর করিয়া হাওয়া বহিতেছে। চাষীরা চলিতেছে আপন গৃহে। শোনা যায় পাখীর কলতান। মুগ্ধ করিয়া তোলে নদীর নির্জ্জন তটে ভাটিয়াল সুর।.........

সীমন্তী যেন হঠাৎ বলিল, চলুন!

: কোথায়?

: জবাব দিতে হবে?

নদীর পাড়ের পায়ে-আঁকা পথ ধরিয়া নিঃশব্দে দুইজন চলিতে লাগিল। একপাশে নদীর কল্লোল ও নদী সৈকতে মায়াবৃত বন, অপর পাশে খোলা মাঠ। মাঠের পর গ্রাম।

সীমন্তী বলিল, চমৎকার এই দেশ! দিগন্ত ব্যাপিয়া শস্য শ্যামল মাঠ, মাঠের ধারে খোলা পল্লীগ্রাম; প্রতি গৃহে অলক্ষ্যে অনাদৃত ভাবে কত ফলফুলের গাছ হয়ে থাকে। দেশের ডাকে নেমেছি! রুক্ষতা, কাঠিন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই জীবন যাবে, এই অপরিসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য হবে না। আগে যদি এর খপর পেতুম তবে এদেশেই জন্ম নিতুম। এ অঞ্চলে যদি জন্ম নিতুম তবে কার সাধ্য ছিল এখান থেকে আমায় তাড়ায়।

ঃ তাড়ালেই বা আপনি যাবেন কেন?

ঃ সে কথা সত্যি? আপনি ত' আমার সহায়, সকল বোঝা আপনিই বইবেন, সকল আঘাতের সুমুখে আপনিই এসে দাঁড়াবেন। যদি নাইবা দাঁড়ান তবে কিসের আপনি আমার সুহৃদ!

ঃ সে সৌভাগ্য যদি হ'ত তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। আপনি যে অবলম্বনকেই এড়িয়ে চলেন। ওইখানেই যে আপনার বিশেষত্বই আপনার নিষ্ঠুরতা।

ঃ না গো বন্ধু না! মেয়েরা অত নিষ্ঠুর নয়। হাজার হলেও ত' আমি নারী জাতি, যত বড় বলেই আস্ফালন করি না কেন, পুরুষকে আশ্রয় করেই উঠতে হবে। কোটি কোটি যুগের পরাধীনতা, পরাশ্রয়তা ভুলে গেলেও অস্থি, মজ্জা, রক্তকে অস্বীকার করি কি করে বন্ধু!

সুমিত সীমন্তীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বজ্রের মত যে কঠিন, মৃত্যুর মত যে দৃঢ় তার মুখে এই দৌর্ব্বল্য, এই ক্লৈব্য সত্য নয় প্রহসন মাত্র! এর কথা বার্ত্তায়, কাজে কর্ম্মে, আচরণে কখনও ত' নারীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এতদিন

এই মানুষটির মধ্যে যাহা দেখিয়াছে তাহা নারী বা পুরুষের নিজস্ব রূপ নয়। যে রূপের আগুন মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সত্যের পথে চালিত করে; ক্লান্তি শ্রান্তি, দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার পীড়ন দলিত করিয়া ভাসাইয়া নিয়া যায়। সুমিত আবার সীমন্তীর মুখের পানে চাহিল। আজ যেন প্রথম মনে হইল সীমন্তী তাহাদেরই পরিচিত নারী। এতদিন যাহাকে দেখিয়াছে, সে এই মানুষটি নয়। এই মানুষটিকে ঘিরিয়া আছে নারীত্ব, স্নেহ, মমতা, প্রেম, সৌন্দর্য্য। এই মানুষটি তাহাদের মতই কাঁদিতে পারে, হাসিতে পারে, ভাল বাসিতে পারে, জীবনের শুষ্ক মরুভূমিতে সুশীতল স্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করিতে পারে। এই মানুষটির সঙ্গে খানিক পূর্ব্বের মানুষটির আকাশ পাতাল পার্থক্য। এই মানুষটি আর পাথরে তৈয়ারী নয়, দেহের চালিত শক্তি স্ফুরিত হয় না ধাতু তৈয়ারি কলকব্জা হইতে। এই মানুষটি কল নয়—মানুষ। এতদিন যাহা দেখিয়াছে, যাহার পরিচয় পাইয়াছে তাহা মিথ্যা, ভুল ও কৃত্রিম।

সীমন্তী গভীর চোখে চাহিয়া বলিল, অত কি দেখচেন ?

সুমিত কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল, দেখচি চাঁদের পরাজয় কতখানি !

ঃ বুঝেছি !

ঃ কি ?

সীমন্তী একটু হাসিল, কোন উত্তর করিল না। পথের পাশেই কতকগুলি রজনীগন্ধার গাছ। সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যৌবনের অঙ্গরাগ উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। সীমন্তী ধীরে ধীরে একটি রজনীগন্ধা গাছকে বাহু বেষ্টন করিয়া আবেশে নয়ন মুদিয়া বলিল, কে

বলে আমি নিষ্ঠুর! কে বলে আমি দেশের কল্যাণের জন্য মানুষ খুন করতে পারি?

সুমিত কয়েকটি রজনীগন্ধার স্তবক ছিঁড়িয়া বলিল, অধিকার আছে কিনা জানিনা। এতদিন য্যাসিড নিয়ে ঘেঁটেছি, মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় শুধু সুলেখা আর আপনি আর আত্মীয়া পিসি, মাসিদের সঙ্গে।

: কিসের অধিকার বন্ধু!

: এই ফুলগুলি আমার হাতে শোভা পায় না, ওর স্থান তোমার ঐ শিথিল কবরীতে!

সীমন্তী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি কবিতা লেখ বন্ধু? লেখ না? তোমার যে কবিতার প্রাণ! বন্ধু দেবে বান্ধবীর শিথিল কবরীতে ফুল গুঁজে, তার আবার অনুমতি নিতে হয় বন্ধু!

খোলা প্রান্তর ধরিয়া সীমন্তী ও সুমিত চলিয়াছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় সীমন্তীর কঙ্কণের মৃদু ঝঙ্কার, পবিত্র হাসির মূর্চ্ছনা, সরল ছোট কথার মধুর ব্যঞ্জনা। পবিত্রতা যেন ওদের ছায়াকেই মহান করিয়া তুলিয়াছে।

বস্তির ধারে আসিতেই সুমিত প্রশ্ন করিল, এই সন্ধ্যা বেলায় কোথায় এলে?

: তোমার কি মনে হয় কমরেড?

: সে ত আমি জানি, কিন্তু —

: কোন সভা সমিতি নেই, তবু কেন এমন সময়ে এই মনুষ্য বাসের অনুপযোগী দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বিষে ভরা স্থানে এলুম—এই ত' তোমার প্রশ্ন? জমিদারের তনয়, কলকাতা আর বিলেতে এতখানি বয়স কাটালে

অথচ যারা সভ্যতার মেরুদণ্ড তাদেরকে চেননা, সেজন্যেই তোমাকে নিয়ে এলুম, যারা বন্ধুর পৃথিবীকে ধনধান্যে পুষ্পে শোভিত করেচে, যারা ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে পৃথিবীকে ভরে দিয়েচে, যারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁত ও অপর্য্যাপ্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েচে, তাদের ত' কখন মানব চক্ষুতে দেখনি ? —আজ সুযোগ পেয়েচ, মানুষের চোখ দিয়েই একবার দেখে যাও।

ঐ দেখ কুলি মজুর সারাদিন খেটে নদীতে চান করে ঘরে ফিরচে, আর আরেক দল সারা রাত্রি গতর খাটাবার জন্য ফ্যাক্টরী অভিমুখে চলেচে। এদের জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য—এক মাত্র সাধনা দেহপাত করে বুভুক্ষা মেটান ! এদের মনুষ্যত্ব নেই, নারীত্ব নেই, মান নেই, সম্ভ্রম নেই, চরিত্র নেই—একমাত্র চরম লক্ষ্য জীবিকার্জ্জন। জন্তুর সঙ্গে এদের প্রভেদ—জীবিকার্জ্জনের জন্য এরা ক্রোড়পতিদের ঐশ্বর্য্যের গৌরীশঙ্করে প্রতিষ্ঠা করে, আধুনিক সভ্যতাকে রূপশ্রী মণ্ডিত করে তোলে আর বুভুক্ষার পীড়নে নারী দেহ ভোগ বিলাসের জন্য সমর্পণ করে, কিন্তু জন্তুদের তা' করতে হয় না এই যা প্রভেদ !

বস্তির পাশে আসিয়া সীমন্তী খোঁপা হইতে ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া বলিল, রাগ কর না বন্ধু ! ও বেশে জননী সন্তানের নিকট যেতে পারে না !

বস্তিতে ঢুকিতেই বাম দিকে একটা শুষ্ক নর্দ্দমা পড়ে। নর্দ্দমাটা নদীর সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। নর্দ্দমা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তীব্র দুর্গন্ধে সুস্মিত নাকে রুমাল দিতে বাধ্য হইল। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিল। দশ নম্বর বাড়ির সুমুখে সুস্মিতকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সীমন্তী অন্ধকার ঘরের মধ্যে মুখ

বাড়াইয়া লছমীকে ডাকিল। লছমী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা অর্দ্ধনগ্না এক যুবতীকে আবছায়া আলোকে দেখিয়া সুমিত চক্ষু নত করিয়া লইল। দুই জনের মধ্যে কয়েকটি কথা হইল, তারপর সীমন্তী মেয়েটির হাতে কি যেন গুঁজিয়া দিল, মেয়েটি জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইল বলিয়া সুমিতের মনে হইল যে, সীমন্তী এই অসুস্থা দুঃখী মেয়েটিকে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছে। সীমন্তী বাহির হইয়া আসিল। সুমিত কোন প্রশ্নই করিল না, কারণ সে ভাল করিয়াই জানে যে সীমন্তী শুধু মেয়েটির দুঃখ কষ্টের কথাই বলিবে, মুখের সান্ত্বনা ভিন্ন কোন উপকার করিতে পারিতেছে না বলিয়া অশেষ দুঃখই করিবে, কিন্তু কখন ভুলিয়াও প্রকাশ করিবে না যে সে নিয়মিত ভাবেই এদের সাহায্য করিয়া আসিতেছে এবং রোগে শোকে সেবা শুশ্রূষা করিতেছে।

উনিশ নম্বর বাড়ির পাশে আসিতেই একটা চেঁচামেচি শুনিতে পাওয়া গেল। একুশ নম্বর বাড়িতে বহু স্ত্রীপুরুষ কুলি দাঁড়াইয়া আছে। সীমন্তী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি হইয়াছে? একজন কুলি বলিল যে, রামদীন ধারে মদ খাইয়া আসিয়া স্ত্রীর নিকট পয়সা চায়। স্ত্রীর হাতে পয়সা না থাকায় সে দিতে পারে নাই কিন্তু মাতাল স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে নাই, ফলে দুই জনের মধ্যে বচসা হয় এবং রামদীন স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে।

সীমন্তী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, মাতাল ব্যাটা বউকা মারতা আর তুম লোক সব মজা দেখতা হায়?

সীমন্তী এক মুহূর্ত্ত দেরি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল, এই উল্লুক ছোড় দাও!

রামদীন স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরিয়া এক টান দিয়া বলিল, কাহে ছোড়েঙ্গে! তেরি নানী......

: চোপরাও শূয়ার! ছাড় দাও বলচি নয় শির ভাঙ্গ দে' গা!

সীমন্তী রামদীনের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। রামদীনের এমন শক্তি নাই যে এই অসীম শক্তিশালিনী মহিলার কবল হইতে ছুটিয়া যায়। সীমন্তী পা হইতে স্যাণ্ডেল খুলিয়া চটাচট কয়েক ঘা গালে পিঠে মারিয়া বলিল, শেরকা বাচ্চা হ্যায়, খুব মরদ হোগা—বউকা মারতা হ্যায় —ব্যাটা মাতাল কোথাকার!

রামদীনের নেশা কাটিয়া গেল, ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সীমন্তী চেঁচাইয়া বলিল, বল কভি জানানা আদমিকা উপর হাত নেই তুলে গা, দারু নেই পিয়ে গা! খত দে হারামজাদা!

রামদীন কাঁপিতে কাঁপিতে খত দিল।

দাম্পত্য কলহ মীমাংসা করিয়া সীমন্তী চলিয়া আসিল। সুমিত খানিক পূর্ব্বে সীমন্তীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছে তারপর আর কোন কথা বলিতে ভরসা পাইল না। মোড়ের একটা অন্ধকার বাড়ীতে সীমন্তী একা চলিয়া গেল। সুমিত মিনিট দশেক বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সীমন্তী নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তার কেরাসিনের মিটমিটে আলোকে সুমিত দেখিতে পাইল যে, সীমন্তী এই মাত্র হাত মুখ ধুইয়া আসিয়াছে। মুখখানি অসম্ভব রকম গম্ভীর; বেদনার প্রতিটী চিহ্ন মুখে ছড়াইয়া আছে। সুমিত অবাক হইয়া ভাবিল, দুনিয়ায় এমন কি কঠিন দুঃখ আছে যাহাতে এই বজ্রের মত পাষাণ হৃদয়ও আর্ত্তস্বরে

কাঁদিয়া উঠিতে পারে? সীমন্তী নিজে কোন কথা বলিল না দেখিয়া স্নমিতও কোন প্রশ্ন করিল না। মনে মনে বলিল, ধন্য এই চাষী মজুর আর শ্রমিক জাতি! যাকে শত দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ ও সাম্রাজ্য-বাদীর কঠিন শাস্তি একটু বিচলিত করিতে পারে না, তাকে এই শোষিত জাতি আর্ত্তস্বরে কাঁদাতে পারে!··

বালক বালিকাদের বিদ্যালয়ে আসিতেই একদল কুলি ছেলে মেয়ে সীমন্তীকে ঘিরিয়া ধরিল। এদের আদর আব্দারের আর শেষ নাই। সীমন্তী হাসি মুখে সকলের সঙ্গে ছেলেমানুষি জুড়িয়া দিল। হঠাৎ একটি কুলি রমণী আসিয়া সীমন্তীর পা জড়াইয়া ধরিয়া মরণ কান্না জুড়িয়া দিল। সীমন্তী ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল,—কি হয়েচে তোমার?

কুলি রমণীর বিলাপ হইতে বহু কষ্টে বোঝা গেল যে, তাহার স্বামীর যক্ষ্মা রোগ আজ আবার দেখা দিয়াছে। অনবরত নাকি রক্ত পড়িতেছে। যক্ষ্মা রোগের নাম শুনিয়া স্নমিত চমকিয়া উঠিল। শঙ্কিত নয়নে সীমন্তীর মুখের দিকে চাহিল। এ সেই রূপ, যে রূপে পুরুষের চিহ্ন নাই, নারীরও চিহ্ন নাই! পরার্থে আত্মোৎসর্গীকৃত পাষাণতা—নির্ম্মম, অচল, অটল, দৃঢ়! এই মূর্ত্তিকে বাধা দেওয়া যায় না, সংযত করা যায় না। এরা মৃত্যুকে বন্ধুরূপে পায়, সেজন্যই এদের ভয় নাই। শঙ্কা নাই, শৈথিল্য নাই, দৌর্ব্বল্য নাই। এরা দুর্ব্বার, দুর্জ্জয়, দুর্দ্দম্য, দুর্ব্বিনীত। স্নমিত মুগ্ধ চিত্তে সীমন্তীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সীমন্তী ইংরাজিতে স্নমিতকে বলিল, বাঁচবেনা! তবু শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তুমি ভাই ফেরার পথে ডাক্তার বাবুকে পাঠিয়ে দিও।

স্নমিত বলিল, তুমি যাবে না?

সীমন্তী বলিল, যাব, তবে কখন যাব ঠিক নেই। মুরলীকে সঙ্গে নিয়ে যাও, ডাক্তার বাবুকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও? যাও, দেরী করো না।

—আমি আবার ফিরে আসব?

—না তোমার এসে কাজ নেই! ভারি ছোঁয়াচে রোগ!

: ছোঁয়াচের ভয়ে আমি পুরুষ মানুষ হয়ে দূরে সরে থাকব আর তুমি থাকবে রোগীকে আগলিয়ে—তা হয় না?

: আমার যা সয়, তোমার তা সইবে না, দয়া করে তর্ক না করে তাড়াতাড়ি ডাক্তার পাঠিয়ে দাও গিয়ে। সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি কিন্তু ফিরে আসতে পাবে না—যাও লক্ষ্মীটি!

সুমিত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। সীমন্তী একমুহূর্ত্ত দেরি না করিয়া রোগীর পাশে ছুটিয়া গেল।

সুমিত বিছানায় শুইয়া সীমন্তীর কথাই ভাবিতে লাগিল। যতই এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে ততই যেন তাহাকে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়। যতই ওর নিকটে যায় ততই যেন মনে হয় সীমন্তী বহু দূরে আছে। আজ সন্ধ্যার যে মেয়েটি নারীর সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, সুষমা নিয়া ধরা দিয়া মুহূর্ত্ত পরে অদৃশ্য হইয়া গেল, যাহাকে সে বস্তির আবর্জ্জনায় রাখিয়া আসিল, সে নারী নয়, পুরুষও নয়; নারী ও পুরুষের উপরে—অতিমানব।... যক্ষা রোগীর পাশে সীমন্তীকে ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ সারা রাত হয়ত মৃত্যুমুখী রোগীর সেবা করিয়াই

কাটিবে। মুখে এক ফোঁটা জলও পড়িবে না। আর সে পুরুষ হইয়া স্বচ্ছন্দে খাওয়া দাওয়া সারিয়া নিদ্রার আয়োজন করিয়াছে, গ্লানিতে সুমিতের মন রি রি করিয়া উঠিল।

সুমিত চুপি চুপি রাজবাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। সুমিত যখন বস্তিতে আসিয়া পৌছিল তখন কলের ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। হঠাৎ একটা মরণ কান্নার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। নিথর, নিস্তব্ধ প্রান্তর—অদূরে কংস নদীর অজগর সাপের মত ফোঁস ফোঁস ধ্বনি, আর অপর পার্শ্বে অবিশ্রান্ত কলের ঘস্ ঘস্ শব্দ। নিস্তব্ধ অন্ধকারে যেন সুমিতের গা টা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

সুমিতকে দেখিয়া সীমন্তী অবাক হইয়া গেল না, যেন তাহাকে লইয়া যাইবার কথা ছিল এমনি ভাবে বলিল,—চল!

: জনমাতার হাতেই লোকটার মৃত্যু হল?

সীমন্তী কোন উত্তর করিল না। সদ্য বিধবা রমণীর হাতে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া সুমিতকে চলিতে ইঙ্গিত করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

উর্দ্ধে সুনীল আকাশ। অসীম আকাশ ব্যাপিয়া হীরক কণার মত অগণিত নক্ষত্র পুঞ্জ, মাঝখানে শুভ্র চন্দ্রিমা। রাস্তার পার্শ্বেই কংস নদী, নদীর ওপারে মায়ায় ঘেরা ছায়ার কত বন বনানী।

সুমিত বলিল, রাত্রিতে যে পৃথিবী এত সুন্দর হয় তা' পূর্ব্বে কখন জানিনি, কোন দিন এ সৌন্দর্য্যের সন্ধানও পাইনি! বেশি রাত নাহলে ওই কুহেলিকাভরা বনানীতে ঘুরে বেড়াতুম। শুভ্র জোৎস্নায় কখন নদীতটের বন-বনানীতে প্রান্তরে প্রান্তরে কালের গতিকে উপেক্ষা করে বেড়িয়েচো?

সীমন্তী কোন উত্তর করিল না, যন্ত্র চালিত হইয়া যেন পথ চলিতেছে। সুমিত আর কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকায় সুমিতের ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি হইয়া গেল। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বিছানায় আর গড়াগড়ি দিতে সাহস হইল না। মনে হইল সুলেখা হয়ত বার দুই ঘুরিয়া গিয়াছে, এবার আসিলে বকিয়া একশেষ করিবে। সুলেখার ভয়ে তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

খাটের পাশে একটা টিপয়ে চায়ের কাপ পড়িয়া আছে। রোজই চা রাখিয়া যায়। ঘুম হইতে উঠিয়াই সুমিত চা খায়, অনেক দিনের অভ্যাস ছাড়াইতে পারে নাই। সুমিত চায়ের কাপটি তুলিয়া লইল। চা একেবারে জুড়াইয়া গিয়াছে। এক চুমুক চা পান করিয়া কাপটা রাখিয়া দিল।

: এই যে নবাব সিরাজদ্দৌলা কষ্ট করে গাত্রোত্থান করেচেন? আজ আর কষ্ট করে না উঠলেই হ'ত—কেউ ত' আর মাথার দিব্বি দেয়নি? সুলেখা শ্লেষমিশ্রিত স্বরে বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

সুমিত সুলেখার গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

: হাসচ, লজ্জাও করে না?

: লজ্জা নারীর ভূষণ! সুমিত হাসিতে হাসিতে মুখ ধুইবার জন্য বাথরুমে গিয়া ঢুকিল।

সুলেখা ঝগড়া করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু সুমিতের কথা শুনিয়া তাহার সকল রাগ পড়িয়া গেল; সুমিতের কথায় না হাসিয়া পারিল না। হাসি মুখেই বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় আসিতেই রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। অসময়ে পিতাকে দরবার হইতে চলিয়া আসিতে দেখিয়া সুলেখা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে তাহাকে দাঁড়াইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। মুখখানি তাঁহার গম্ভীর। পিতার গম্ভীর মুখ দেখিয়া সুলেখা চিন্তিত হইয়া পড়িল।

রাজনারায়ণ বসু প্রশ্ন করিলেন, খোকা কোথায়?

সুলেখা পিতার গম্ভীর স্বর শুনিয়া আজ আর সত্য কথা বলিয়া আমোদ করিতে সাহস পাইল না। বলিল, ওঁর ঘরে আছে।

: ঘুম থেকে উঠেচে?

: অনেকক্ষণ হ'ল উঠেচে!

হুঁ! রাজনারায়ণ বসু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তুই ওকে বলে দিস্ যে আমি সাবধান করে দিয়েচি! আমাব এখানে ওসব চলবে না!

: কি হয়েচে বাবা?

ইডিয়টটা আমায় ডোবাবে। চরিত্রহীন মেয়ের কবলে পড়েচে, আমার মান সম্ভ্রম সব ডোবালো।

: আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না বাবা!

: ওই কংগ্রেসী মাগীর কবলে পড়েচে! কাল রাত্রে খোকা বেরিয়ে গিয়েছিল! শেষ রাত্রে ঘরে ফিরেচে।

: অসম্ভব! দাদা অমন ছেলেই নয় যে না বলে রাত্রে বেরিয়ে যাবে।

: প্রমাণ আছে। বহু লোক ওকে ও ওই নষ্টা মাগীকে একত্রে দেখেচে!

: মিথ্যে কথা!

: মিথ্যে নয় মা মিথ্যে নয়! কাল রাত্রে খোকা চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়েছিল। শেষ রাত্রে সীমন্তীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বিজয়বাবু দেখেচেন, আক্রাম মিঞা দেখেচে। কাল সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে ওদেরকে ফুল তুলতে অনেকেই দেখেচে।

: তুমি কি করতে চাও?

: করব আর কি! এখন ত' আর ছেলে মানুষ নয় যে আচ্ছা করে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেব কিংবা ঘরে আটক করে রাখব!

সুলেখা নিঃশব্দে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া আঁচড় কাটিতে লাগিল।

রাজনারায়ণ বসু বলিয়া চলিলেন, তোর মা'ও নেই যে ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রক্ষা করবে। আমার মেজাজ ত' জানিস, বুঝিয়ে সুঝিয়ে যে দেব তার উপায় নেই! এ যুগের যুবক তায় আবার স্বদেশীওয়ালাদের খপ্পরে পড়েচে—রাগের মাথায় কিছু বলে ফেলব আর অমনি খোকা উঠবে তেড়ে! তুই হাসচিস্—হাসি নয় মা, শেষটায় হিতে বিপরীত হতে পারে। মেয়ে ছেলে নিয়ে কলঙ্কের ব্যাপার—আমি নিজের মুখে বলিই বা কি করে? তোর মা নেই বেঁচে, নইলে উনিই খোকাকে এই রাক্ষসীর কবল থেকে বাঁচাতেন।

: তুমি লোকদের কথায় বিশ্বাস করে দাদার ওপর অবিচার কর না বাবা!

: অবিচার নয় মা! আমরাও চিরকাল বুড়ো ছিলাম না। ভাল ছেলেদের ভয় বেশী মা। খারাপ ছেলে বোকা হয় না কিন্তু ভাল ছেলেগুলি বড় বোকা থাকে। সিরিয়াস ছেলেগুলি যখন এ পথে পা দেয় তখন শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে যায়। সে কথা

থাক্, খোকা তোকে বেশী ভয় খায়, তুই বরং একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর!

: আমার কথা শুনবে?

: শুনবে! শুনবে! না শুনলে ছাড়বি কেন? এমনি ত কত রকমারি আইন পাশ হচ্চে, নতুন আইনের জোরে লাট সাহেব প্রজাদের কথা কইবার উপায় নেই, তারপর যদি এই হিংসুটে পরশ্রীকাতর স্বদেশীওয়ালাদের দলে নিজের পুত্রই যোগদান করে জমিদারের উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করে তবে কি উপায় হবে তুই-ই বলত? বোকাটা বুঝ্চে না এদের ষড়যন্ত্রের কথা! ওই বোকাটা আসচে! আমি যাই, তুই, বুঝিয়ে বলিস।

রাজনারায়ণ বসু বাহির হইয়া গেলেন। সুলেখা নীরবে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা যে গুরুতর অভিযোগের কথা বলিয়া গেলেন তাহা তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না। তাহার দাদার মত সংযমী বীর পুরুষের চরিত্র কিছুতেই খারাপ হইতে পারে না। পিতা নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছেন, নিশ্চয়ই কেহ ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া এইরূপ দুর্ণাম রটাইয়াছে।

সুমিত চা খাইতে আসিল। সুলেখা রোজই নিজের হাতে সুমিতের চা তৈরী করিয়া দেয়। আজও নিজের হাতেই চা তৈরী করিয়া দিয়া এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অধিক রাত্রি জাগরণে সুমিতের শরীরটা তেমন ভাল বোধ হইতেছে না বলিয়া নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিল।

খাবারগুলি এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। সুলেখা খানিক অপেক্ষা করিয়া বলিল, খাবার ছুঁলে না যে বড়?

: শরীরটা ভাল বোধ হচ্চে না !

সুলেখা হুঁ বলিয়া একটা পোজ নিল।

সুলেখার মুখের দিকে তাকাইয়া সুমিত প্রশ্ন করিল, মানে ?

সুলেখা কোন উত্তর করিল না। নীরবে একটা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর ভাবে সুমিতের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুমিত খানিকক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিল, তোকে আজ অত গম্ভীর দেখচি কেন রে খুকী ? বিবেকানন্দ বাবুর চিঠি পাসনি বুঝি ? তথাপি সুলেখা কোন উত্তর করিল না, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল।

: বোবায় ধরেচে নাকি ? সুমিত হাত ঘড়িতে সময় দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

: খাবার না খেয়ে উঠে পড়চ যে !

: ক্ষিধে নাই, শরীরও ভাল নয়। পৌনে দশটা বাজে, আমার আবার দশটায় একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

: ও! সীমন্তীর সঙ্গে সম্ভবত তোমার এনগেজমেণ্ট আছে। বস এখানে, জরুরী কথা আছে !

: তোর ত' সবই জরুরী কথা ! এখন থাক, পরে ধীরে সুস্থে তোর জরুরী কথা শোনা যাবে'খন !

সুলেখা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আমার কথা যেন তোমার কানেই যাচ্চে না, না ?

সুমিত হাসিয়া বলিল, কানে যায়নি বলিস কি ? সত্যি আমার জরুরী কাজ আছে !

: আমার তার চেয়ে বেশি জরুরী কথা আছে। চল তোমার ঘরে। তোমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।

সুমিত সুলেখার কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়া জামা কাপড় পরিবার জন্য নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সুমিত তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিল দেখিয়া সুলেখা গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে ও অভিমানে তাহার কোন বাক্য নিঃসরণ হইল না। অল্পক্ষণ মধ্যে সুমিত জামাকাপড় পরিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, সু ভাই রাগ করিসনে, সত্যি আমার বিশেষ কাজ আছে! দুপুরে তোর সকল গুরুতর কথা শুনব!

সুলেখা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—দাঁড়াও!

সুমিত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, তোর হয়েচে কি বলত? জামাই বাবুর চিঠি পাসনি বলে বুঝি মেজাজ ভাল নেই! বেচারী নতুন এ-ডি-এম হয়েচে!

: ফাজলামো করতে হবে না! কোথায় যাচ্চ?

: কাজে যাচ্চি!

: সেত' বুঝলুম, কিন্তু কি কাজ? কোথায় তোমার অত কাজ হঠাৎ গজিয়ে উঠল?

: কাজটা যে কি তা এখনও সঠিকভাবে আমিও বলতে পারি না! তবে বিশেষ কাজ যে আছে সে কথা সত্যি!

: কিন্তু কার সঙ্গে তোমার এই বিশেষ কাজ?

: সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে আমার গুরুতর কাজ। তুই অতশত বুঝবি নে!

: বক্তৃতা রেখে এখন বলত কার কাছে তুমি যাচ্ছ ?

: সীমন্তী দেবীর কাছে যাচ্ছি !

: সেখানে তুমি আর যেতে পাবে না !

: মানে !

: মানে অনেক, আমার হল, তুমি আর ওর সঙ্গে মিশতে পাবে না !

: কি বলচিস ?

: আমি ঠিকই বলচি ! তুমি সীমন্তীর সঙ্গে আর মিশতে পাবে না !

: পাগলামী করিস না খুকী !

: আমি মোটেই করচি না ! আমি বরঞ্চ আশ্চর্য্য হচ্চি তুমি উল্টো তর্ক করচ বলে ! সীমন্তীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হবার আগে তুমি কখন আমার কথায় প্রতিবাদ করনি !

: প্রতিবাদ করিনি বলে এবং তোদের কথা, তোদের বাধা নিষেধ নির্ব্বিচারে মেনে চলেছি বলেই ত' আমি লেখা পড়া শিখেও একটা প্রথম নম্বরের ইডিয়ট হয়েচি ! তোদের মত মা, বোনের সর্ব্বনাশী স্নেহে বাঙলার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেচে, তোদের হীন বাৎসল্যের প্রাচুর্য্যে বাঙালী ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষে পরিণত হয়েচে। কথাটা রঙ্গমঞ্চের বক্তৃতার মত শোনাচ্চে না ? কিন্তু বক্তৃতাই হোক আর যাই হোক না কেন কথাটি ধ্রুব সত্য ! আমি তোদের আর বাধা নিষেধ মেনে চলব না। আমি যা ন্যায় ও সত্য বলে বিশ্বাস করব তাই মেনে চলব !

: সীমন্তী তোমার মহা সর্ব্বনাশ না করে ছাড়বে না দেখচি !

: বোকার মত কথা বলিসনে !

: সর্ব্বনাশ নয়ত' কি ?

: তোর বিচার বুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে ত' দুনিয়া চলবে না ? তোর কাছে যা সর্ব্বনাশ বলে মনে হচ্ছে তা অপরের কাছে মহা কল্যাণ-কর বলে মনে হতে পারে।

: চুপি চুপি গভীর রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া, একটি যুবতী নারীর সঙ্গে রাত্রিতে থাকা মহাকল্যাণকর, না ?

: তুই বলচিস কি ?

: আমি ঠিকই বলচি। তুমি রাত্রি করে সীমন্তীর বাড়িতে যাও না ? সারারাত্রি সে বাড়িতে থাক না ? আর শেষ রাত্রে বাড়ি ফিরে আস না ? অস্বীকার করতে পার ?

: তোর মুখ থেকে যে এমন একটা হীন কথা বেরুতে পারে তা' আমার ধারণাতীত. নিজের কানে না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতুম না।

: বিশ্বাস করতে না ? তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েচে যে মিথ্যা কথা বলতেও মুখে আটকায় না।

: আমি মিথ্যা কথা কখনও বলিনি এবং বলবও না ! তোকে কে কি বলচে তা' শুনবার আমার এতটুকু আগ্রহ নেই ! আমি শুধু তোকে এই কথাই বলব যে, কাল রাত্রে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলুম এবং সীমন্তী দেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলাম।

: তোমাদের কীর্ত্তি কলাপ লোকের জানতে আর বাকি নেই ! তুমি নিজেত' অধঃপাতে যাচ্ছই, বাবার উঁচু মাথাও ত নীচু করচ !

: স্মিত একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, আমি কি হচ্চি বা না হচ্ছি এবং কি করচি তার জবাবদিহি করব না। তোর কাছে কোন দিন করব

এমন উচ্চ ধারণা নিজের পর কখনও রাখিস নি। শত্রু নিপাতের জন্য যে অস্ত্র ছাড়া হয়েচে তাতে শত্রুর কোন ক্ষতিই হবে না সুলেখা! যারা এরূপ হীন লোকদের অত্যাচার থেকে দুর্গতদের রক্ষা করতে সংগ্রামে নামে ওদের এ সকল মিথ্যা কলঙ্ক, ভুয়া মান অপমানের ভয় করলে চলে না। যাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য এরূপ হীন চেষ্টা করচিস তার পদধূলির যোগ্য নোস তোরা!

সুমিত সুলেখাকে কোন উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাহাড়ী নদী। আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবল স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। নদীটি খরস্রোতা বলিয়া উজান বাহিয়া যাইতে বেশ কষ্ট হয়। হাওয়াও তেমন নাই যে পাল খাটান যাইতে পারে। ছোট পানসীটি মৃদুমন্দ গতিতে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

পানসীতে তিনজন মাত্র যাত্রী আর দুইজন মাঝি। যাত্রীরা এতক্ষণ নীরবেই চলিয়াছিল, হঠাৎ আলতাফ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, কুমার সাহেব আজ বক্তৃতা দেবেন ত' ?

সুমিত এতক্ষণ তন্ময় হইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতেছিল। গারো পাহাড়ের গা' বাহিয়া কংস নদী নীচে নামিয়া আসিয়াছে। চঞ্চল ইহার গতি, প্রচণ্ড ইহার শক্তি, মিলন ইহার ধর্ম্ম ! কে জানে কত যুগ ধরিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় অন্ধকার কারাগৃহে রুদ্ধ রহিয়াছে। কত যুগ ধরিয়া পাষাণ দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মুক্তি চাহিয়াছে! কোন অদৃশ্য দেবতাই-বা, তাহাকে সোনার কাঠি ছুঁয়াইয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মুক্তির দ্বার দিয়া পৃথিবীর বুকে আনিয়া দিয়াছে? মুক্তির আলোকে সে এত শক্তিই বা পাইল কোথায়? যে শক্তির বলে পাষাণদ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া পৃথিবীর প্রশস্ত বক্ষে উন্মাদের মত নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কংস নদীর চঞ্চল গতির দিকে সুমিত যতবার তাকায়

ততবারই তাহার নিকট মুক্তি কথাটা বিস্তৃত ভাবে ধরা দেয়। ওই পাহাড়, ওই নদী, ওই বন, ওই মাঠ যত কিছু তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে সকলই স্বাধীন, সকলই মুক্ত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সচল, যাহা কিছু অচল সকলই মুক্ত। মুক্তিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম। আকাশে, বাতাসে, আলোকে, অন্ধকারে সর্ব্বত্রই মুক্তির বাণী ওতপ্রোতভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। মুক্ত এই ধরণী! মুক্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! শুধু কি মানুষেরই মুক্তি নাই? শক্তিশালী মানব কিসের অভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, মুক্তির মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া যায়? যে দুর্ব্বার শক্তিতে ক্ষুদ্র কীটানুকীট মাতৃগর্ভে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া আলো ও বাতাসে স্বয়ম্ভূত হয়, সে কোথায় হারাইয়া আসে এই অসীম শক্তি, হারাইয়া আসে মুক্তির মহাবাণী? যে কীটানু দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া দুর্জ্জয় শক্তির বলে সকল বন্ধন, সকল শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধরার বুকে ছুটিয়া আসে, সে কেন মহাশক্তি হারাইয়া ফেলে, কেন মহাজ্ঞান বিস্মৃত হয়?

মুক্তি কি মানুষ পাইতে পারে না—যে শক্তির বলে মানুষ অদৃশ্য কীটানুকীট হইতে মানুষে পরিণত হয় তাহা কি পুনরায় লাভ করিতে পারে না? বিশ্ব মানবজাতি কি আত্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হইতে পারে না?...মুক্তি? সুমিত চমকিয়া উঠিয়া ভাবে, কিসের মুক্তি?...

নৌকাটি নদীর বাঁক ঘুরিয়া আগাইয়া চলে কিন্তু সুমিতের মনে মুক্তির সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয় না! রাষ্ট্র, সমাজ, মানবীয় বন্ধন, দেহ জীবন—কত কি তাহার মনে আসিয়া চিন্তাধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া

তোলে। সে কিসের মুক্তি চায়? তাহার অন্তর দেবতা কিসের মুক্তি কামনা করে আভাসে? সে কি শুধু নিজেদের মুক্তি কামনা করে, না বিশ্বমানব জাতির মুক্তি কামনা করে? ক্ষুদ্র মানবকে অন্তর-দেবতা ধরা দিয়াও ধরা দিতে চাহেনা, শুধু বিমূঢ় মনের উদ্বেলতা বাড়াইয়া চলে। সাধনাই সে করিবে—এই বিশ্বপ্রকৃতির পদতলে বসিয়া সে সাধনাই করিবে।…

আলতাফের প্রশ্ন সুমিত শুনিতে পায় নাই দেখিয়া সীমন্তী একটু জোর দিয়া বলিল, অত কি ভাবচ সুমিত?

সুমিত চোখ ফিরাইয়া লইল। সীমন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, ভাবচি মুক্তি—যার সংজ্ঞা নিয়ে মানুষের এত মতানৈক্য!

সীমন্তী একটু হাসিল, কোন কথা বলিল না।

সুমিত বলিল, হাসচ যে বড়?

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, ও আমার স্বভাব! লোকে অভিযোগ ক'রে বলে কাটখোট্টা মানুষ। রাজবন্দীর জীবন একেবারে নিরেট ক'রে দিয়েচে তাই মাঝে মাঝে এমনি একটু হাসতে চেষ্টা করি, কেউ দেখে ফেল্‌লে বলি স্বভাব।

সুমিত একটু অভিমান করিয়া বলিল, বড় সমস্যা নিয়ে ভাবচি বলে তুমি হাসচ! ভাবচ আমার মত সামান্য লোকের এত বড় সমস্যা নিয়ে ভাবা শোভা পায় না।

আলতাফ বলিল, আপনি ভুল বুঝছেন কুমার সাহেব। এঁদের রক্তে ভগবান যত বড় সত্য নয় তার চেয়ে বড় সত্য আত্ম-শক্তি, আত্ম-বিশ্বাস। রাশিয়া ফেরতা লোক তাই কেউ যখন মোক্ষপ্রাপ্তি নিয়ে

ব্যাকুল হয় তখন দিদি মনে মনে না হেসে পারে না। পশুরূপে বা যন্ত্ররূপে যে কোটি কোটি নর-নারীর জন্ম হয় তাদের মুক্তির সংগ্রামে আপনাকে প্রধান সেনাপতি করবার দিদির যে আশা ছিল তা'তে প্রতিবন্ধকতা পড়বার সূচনায় দিদির অন্তর ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠেচে। আত্মশক্তিমানের ওই হাসি দুর্ব্বলতারই পরিচয়।

সীমন্তী আলোচনার ধারা ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিল, আলতাফ জিজ্ঞেস করছিল তুমি আজ বক্তৃতা করবে কিনা?

সুমিত বলিল, বক্তৃতা করা আমার মোটেই অভ্যাস নেই, বিশেষ করে তোমাদের মত বাগ্মীদের সাম্নে। তারপর যাদের নিকট আবেদন করব, কিংবা যাদের উপদেশ দেব তা'দের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। জ্ঞানত মানুষের যত বড় ভাল বা মন্দ করা যাক না কেন তার একটা সীমা থাকে, কিন্তু অজ্ঞতাবশত করলে তার সীমা পরিসীমা থাকে না?

সীমন্তী বলিল, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তোমার সে ভয় নেই। এই কৃষক ও মজুর একটা এমন জাত যাদের দু'চার কথায় যেমন ভালও করা যায় না তেমনি ক্ষতিও করা যায় না।

সুমিত প্রশ্ন করিল, সভায় কেমন লোক হবে? বড় সভা হলে আমি কথা বলতেই পারব না। কেঁপে, ঘেমে যা আবোল তাবল বলে বসব তা কেউ শুনতেই পাবে না।

আলতাফ বলিল—কুমার'

সীমন্তী ধমক দিয়া বলিল, ফের যদি কুমার সাহেব বলবে ত' থাপ্পর খাবে! এখানে কুমার সাহেব, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর বলে সঙ্

বানান চলবে না। বাপ মা নাম রেখেচেন নাম ধরে ডেকো—বয়সে যখন বড় তখন একটা 'দা' শব্দ যোগ করে দিতে পার।

আলতাফ হাসিয়া বলিল, সুমিতদা, ছোট সভায় যারা বক্তৃতা করতে পারে, তারা বড় সভাতেও বক্তৃতা করতে পারে। আপনি ভয় পাবেন না, আপনি এখানকার ভাবী জমিদার, আপনার বক্তৃতার অনেক মূল্য আছে।

নদীর দুই পাশে কত প্রান্তর, কত বন বনানী, কত গ্রাম, কত মাঠ, কত নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতের শাখা উপশাখা পশ্চাতে ফেলিয়া ছোট পানসীটি চলিয়াছে। সূর্য্যদেব এই মাত্র মধ্যাহ্ন আকাশ হইতে কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িয়াছেন। শরতের আকাশ—স্বচ্ছ নির্ম্মল, স্নিগ্ধ। অদূরে ওই গারো পাহাড়ের উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। সূর্য্যালোক গিরিশৃঙ্গগুলির সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুমিত মুগ্ধনয়নে গারো পাহাড়ের শৃঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

ওই গিরিশৃঙ্গগুলি কত শান্ত, কত গম্ভীর, কত মহান। পর্ব্বত শ্রেণী এত পাষাণ বলিয়াই মৃত্যুর মত এত দৃঢ় এবং এত গভীর বলিয়াই মানুষ ইহার কোন কূল কিনারা পায় না, অজ্ঞানের মত বিভ্রান্ত হইয়া উঠে। সুমিত কত পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী দেখিয়াছে কিন্তু কখনও ত' এত বড় বৃহত্তরের সন্ধান পায় নাই। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, অতীত ঐতিহ্য, সমাজ কোন কিছু দিয়াই ত' ইহার পরিমাপ করা যায় না, ইহাকে একটুকু বুঝিতে পারা যায় না। নদ নদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্ব্বত, বন বনানীকে আশ্রয় করিয়া যাহারা জীবনপাত করে তাহারাও ত' ইহাদের চিনে না। কতবার ত' সে ইহাদের মাঝে ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কখনও ত' তাহার অন্তর দেবতা মুহূর্ত্তের তরেও সাড়া দেয় নাই। ভালকে

সে ভালই বলিয়াছে, সুন্দরকে সুন্দরই বলিয়াছে এবং কুৎসিৎকেও সুন্দর বলে নাই। ইহাদেরও প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ, বিরহ মিলন আছে বলিয়া শুনিয়াছে—বিশ্বাসও হয়ত সে করে কিন্তু আজ তাহাকে ইহারা এমন করিয়া ভাবাইয়া তুলিল কেন? বৈদিক যুগে সভ্য ও চিন্তাশীল নরগণ ইহাদের প্রাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন—বিজ্ঞানের উন্নতিতে এ যুগেও তাহারা না বুঝিতে পারিলেও বিশ্বাস করিতে পারে কিন্তু আজ তাহার অনুভূতিতে যাহার আভাস সে পাইতেছে তাহা ত' এই অচলের সচলতা,জড়ের প্রাণ ও তাহাদের বিকাশের কথা নয়—ইহা অনেক বড় কথা, অনেক দুর্বোধ্য। ইহার সে শুধু আভাষই পায় উপলব্ধী করিতে পারে না। শুধু আলোড়ন তুলে, সাড়া দেয় না।

সীমন্তী বহুক্ষণ যাবৎ সুমিতের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। জাতীয় সংগ্রামে যাহাকে সাথী করিয়াছে, যাহাকে কয়েক দিনের মধ্যে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া লইবে, তাহাকে গঠন করিয়া লইবার অনেক বড় গুরুদায়িত্ব তাহার পড়িয়া রহিয়াছে। সুমিত জমিদার, উদার, সচ্চরিত্র, সরল ও উচ্চশিক্ষিত। নেতা হইবার সকল গুণই তাহার রহিয়াছে কিন্তু তাহাকে ত' সে দশজনের মত পাইতে চায় না। তাহাকে সে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নেতারূপে পাইতে চায়। শুধু মহত্ব ও শক্তি দিয়া এই যুগে নেতা হওয়া যায় না—জাতি সমাজ ও রাজ্য গঠন করা যায় না। বাস্তব অভিজ্ঞতা চাই; বিশ্ব-রাজনীতিবিদ হওয়া চাই। সুমিতের নিকট বাস্তব জগত অন্ধকার। তাহার অজ্ঞতার গাঢ়তমসা তাহাকেই দূর করিতে হইবে, তাহাকে আদর্শবাদের দুর্গম সোপান হইতে কয়েক ধাপ নীচে টানিয়া আনিয়া বাস্তবের সহিত একটা যোগাযোগ করিয়া দিতে

হইবে। যদি সে সফল হইতে পারে তবে ওই নির্জ্জন পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া দুই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অতীত পানে চাহিতে চেষ্টা করিবে। তার পূর্ব্বে যে তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ঘাটে আসিয়া পানসী ভিড়িল। আশীষ পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিয়াছে, হয়ত সকল আয়োজন গুছাইয়া রাখিবার জন্য গতকল্যই সে এই অঞ্চলে আসিয়াছিল। ঘাটের নিকট পানসী আসিতে না আসিতেই আশীষের নেতৃত্বে এক দল গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

স্বেচ্ছাসেবকদের জয়ধ্বনিতে বিপুল জনতাও সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দিগন্তব্যাপি জয়ধ্বনিতে সুমিত থমকিয়া গেল। জনতার জয়ধ্বনি যে এত প্রবল, এত ব্যাপক, এত ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা সে স্বকর্ণে না শুনিলে বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার মনে হইল, এত বড় চীৎকারে সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণী, পাতাল হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত সমস্ত নদীটা যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সুমিত বিপুল জনতার দিকে চাহিয়া দিক্‌ভ্রান্তের মত চক্ষু ফিরাইয়া লইল। লোকারণ্য দৃশ্য সে ছবিতে দেখিয়াছে, পুস্তকেও পড়িয়াছে কিন্তু কখনও সে এইরূপ বিপুল জনতা চোখের উপর দেখে নাই। ইউরোপে, রাশিয়ায়, ভারতবর্ষে সে লক্ষ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা দেখিয়াছে, সভা দেখিয়াছে কিন্তু এমন জনতা সে কখন দেখে নাই। সহস্র সহস্র অশিক্ষিত, অসংস্কৃত সরল কৃষক নদীর তীর ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের দর্শন করিবার জন্য। নিয়ম কানুন

নাই, শৃঙ্খলা নাই, মান সম্মান নাই—বন্যার স্রোতের মত গ্রাম গ্রামান্তর, পথঘাট, মাঠ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

সুমিত সীমন্তীর দিকে চাহিল। জনমাতার বন্দনার পূর্ব্বেই সীমন্তী জোড় হাত করিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সন্তানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অপূর্ব্ব! সুমিত তাড়াতাড়ি মাথা নত করিল এবং জনতাকে উদ্দেশ করিয়া হাত জোড় করিল।

কূলে পানসী ভিড়িলে সীমন্তী, সুমিত ও আলতাফ পাড়ে আসিয়া উঠিল। এই বিপুল জনতাকে সংযত করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আশী-ষের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভিড়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মান্য অতিথিদের সভামঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য রাস্তা করিয়া দেওয়া ত দূরের কথা তাহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করাই সুকঠিন। আশীষ বহুকষ্টে বহু বক্তৃতা করিয়া অনেকক্ষণ জনতাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না। সীমন্তীকে দর্শন করিবার জন্য শত শত লোক নয় দশ মাইল দূর হইতে পর্য্যন্ত আসিয়াছে। বিকালে সভা হইবার কথা কিন্তু চাষী মজুরগণ সকাল বেলা হইতেই এইখানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীর তীরের সম্মুখবর্ত্তি স্থান অধিকার করিয়া বহু লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছে। যাহারা বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে না পারায় গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছিল তাহারাও সীমন্তীর আগমন সংবাদ পাইয়া নদীর তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে। বহু লোক গাছের ডালে ডালে আশ্রয় লইয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকারা বাবা, কাকা, দাদার কাঁধে চড়িয়াছে। স্ত্রীলোকগণ কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া লম্বা লম্বা ঘোমটা টানিয়া গ্রামের প্রান্তের বটগাছটার নীচে আসিয়া জড় হইয়াছে।

কংসনদীর তীরে

গ্রামের মোড়লগণ বহু কষ্টে জনতার মাঝখান দিয়া একটা সরু রাস্তা করিয়া দিল। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক, আশীষ ও মোড়লগণ অতিথিদের বেষ্টন করিয়া সভামঞ্চে লইয়া আসিল।

সীমন্তী সভামঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলে আশীষ 'বন্দেমাতরম্' 'জনমাতা কী জয়', 'কংগ্রেস কী জয়', 'কিষাণ কী জয়' বলিয়া ধ্বনি করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জনতাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জয়ধ্বনির পর মোড়লগণ 'এখন সভা আরম্ভ হইবে' বলিয়া জনতাকে বসাইয়া দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এই বর্ব্বর বিপুল জনতা অগ্রপশ্চাৎ ঠেলাঠেলি করিয়া ঘাসের আসনে বসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে চুপ করিয়া গেল। যাহারা খানিক পূর্ব্বে হৈ হৈ করিতেছিল, বর্ব্বরের মত ঠেলা-ঠেলি. হুড়ো-হুড়ি করিতেছিল, গোঁয়ারের মত সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল. তাহারাও কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

কয়েকটি বালক হারমোনিয়ামের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাহিবার পর স্থানীয় অঞ্চলের একজন যুবক স্মিতকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব করিল এবং আলতাফ-ও আশীষ প্রস্তাবটি সমর্থন করিল।

প্রথমে সুরঞ্জনবাবু বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল কংগ্রেসের আদর্শ, কংগ্রেসের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা। সুরঞ্জনবাবু বক্তৃতার ভূমিকা এবং মান্য অতিথিদের পরিচয় দিতে গিয়াই তাঁহার বক্তৃতার নির্দ্দিষ্ট সময় পার করিয়া দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত 'দিকৃপাল নেতাগণ থাকিতে আমার মত অতি নগণ্য ব্যক্তি কি আর বলিবে' গোছের বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করিলেন। উৎকৃষ্ট বক্তৃতার মাধুর্য্যে জনগণ ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল। ইহার পর কয়েকজন

গ্রাম্য যুবক ও মোড়লগণ বক্তৃতা করিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান না থাকিলে অপরকে বুঝাইতে যাওয়া যেমন বিড়ম্বনা ইহারাও বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তেমনই বিড়ম্বনায় পড়িলেন। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন তাহা কেহই না বুঝিলেও সকলেই এইটুকু বুঝিতে পারিল যে, সীমন্তী-দেবী একজন সাক্ষাৎ দেবী, তাঁহার চরণ ধূলি পাওয়া ভাগ্যের কথা এবং কংগ্রেস একটা ঐশ্বরিক শক্তিবিশেষ, ইহা শীঘ্রই ইংরেজকে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে তাড়াইয়া দিবে। স্বয়ং জমিদার পুত্র যখন ইহাতে যোগদান করিয়াছেন তখন কংগ্রেসে সকলেরই যোগদান করা উচিত।

স্থানীয় লোকদের বক্তৃতা বা ব্যক্তিগত অজ্ঞতার স্বীকারোক্তির পর সীমন্তী বক্তৃতা করিতে উঠিল। সীমন্তী উঠিয়া দাঁড়াইতেই সকলে সমস্বরে 'জনমাতা কী জয়', 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জয়-ধ্বনির পর সীমন্তী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল।

সূর্য্যদেব তখন পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। সূর্য্যের রক্তিম আভা পর্ব্বত শিখর, গাছের শাখায় শাখায়, নদীর চঞ্চল ঢেউএ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নির্জ্জন পৃথিবী! মুগ্ধ নরনারী সম্বিৎহারার মত সীমন্তী দেবীর দিকে চাহিয়া আছে। রক্তিম আলোচ্ছটা আসিয়া মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হিমালয়ের মত সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের নিকট সকলের মস্তক শ্রদ্ধাভরে অবলুণ্ঠিত হইয়া আছে।

সীমন্তী প্রথম কংগ্রেস কি এবং ইহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল।

প্রত্যেক মোড়লদেরই এক একটি দল রহিয়াছে। মোড়লগণ গলায় রঙিন রুমাল বাঁধিয়া, মাথায় টুপী পরিয়া বা গামছা জড়াইয়া শান্তি ও

শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। কেহ করতালি দিলে, দলের লোকগণও করতালি দেয় এবং আশে পাশের সকলকে করতালি দিবার জন্য বলে। কোন এক যুবক হয়তো অন্যমনস্ক ছিল, সময় মত করতালি দিতে পারে নাই বলিয়া বন্ধুদের নিকট অপ্রস্তুত হইয়া যায়। নিজের সম্মান পূরণ করিবার জন্য 'লাউডা' (লাউডার) পিজ (প্লিজ) বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। তারপর সে গর্ব্বিত ভাবে বন্ধুদের দিকে একবার তাকাইয়া একটা পোড়া বিড়ি ধরায় এবং বন্ধুরা কেন করতালি দিয়াছিল তাহা প্রশ্ন করে। করতালি যে কেন দিয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না, তবে ভাল একটা কিছু হইয়াছে বলিয়াই যে তাহারা সকলের সঙ্গে সঙ্গে করতালি দিয়াছিল, তাহা জোর করিয়া গর্ব্বিত ভাবে বলিতে পারে।

সীমন্তীর পরে আলতাফ এবং তাহার পরে সুমিত বক্তৃতা দিল। অতঃপর সুমিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিল।

জনতা 'বন্দেমাতরম্', 'কংগ্রেস কী জয়' ও 'জনমাতা কী জয়' 'কৃষক কী জয়' প্রভৃতি বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

সভার পর সীমন্তী, সুমিত ও আলতাফ গ্রামে জলযোগ করিয়া গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শরতের শুভ্র স্বচ্ছ নীল আকাশ। পূব আকাশের দিকচক্রবাল রেখা অতিক্রম করিয়া শরত শশী ক্রমশ উর্দ্ধে উঠিতেছে।

নির্জ্জন নদী, মসৃণ তাহার গতি। কংস নদীর স্রোতে পানসীটি ভাঁটার দিকে চলিয়াছে। দীর্ঘ নদীর কোণে একটি মাত্র পানসী। আর

কোথায়ও জন মানবের সাড়াশব্দ নাই। নদীর দুই তীরে গারো পাহাড়ের শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া রহিয়াছে।

শীত পড়িতেছে। চারিদিকে কুয়াসা ধীরে ধীরে মায়াজাল বুনিয়া চলিয়াছে।

স্মিত বিমুগ্ধ নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া রহিল। নির্জ্জন পৃথিবী যে এত সুন্দর তাহা সে কখনও জানিত না। পাহাড়ের গহ্বরে গহ্বরে, গাছের শাখায় শাখায়, লতায় পাতায় নিঝুমতা ছড়াইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। নিঝুমতার যে এত সৌন্দর্য্য তাহা সে কখনও জানিত না। এই বিপুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝা যায় না—উপলব্ধী করিতে হয়।

নদীর দুই তীর ব্যাপিয়া ঝাউ হিজল বন যেন মহামায়া সৃজন করিয়া রাখিয়াছে। বড় বনের ধারে কত বরুণ, কেয়া, কাশ, কাঠ-গোলাপ, রজনীগন্ধা, শেফালী কত প্রকার ফুল গাছ হেলিয়া দুলিয়া কংসনদীর জলতরঙ্গের তালে তালে নাচিতেছে।

বড় বিলটার সঙ্গে যেখানে নদীর যোগাযোগ রহিয়াছে সেইখানে বহু ধীবর নৌকা লইয়া মাছ ধরিতেছে। ইহারা প্রায় সারা দিনরাত নদীতে মাছ ধরে। সেই মাছ নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি সহরে রপ্তানী করা হয়। ইহারা মাছের ব্যবসা করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। সেজন্যই হয়ত মাছ ইহাদের জলচর প্রাণীতে পরিণত করিয়া দেয়।

ধীরে ধীরে নৌকা চলে। স্মিতের মনে কত কথা আসিয়া জড় হয়। কংগ্রেস, জাতীয় সংগ্রাম, সীমন্তী, আশীষ, আলতাফ, ফুলকোয়ারা, সুলেখা কাহারও কথাই তাহার মনে পড়ে না। মুক্তির বাণীই তাহার মনে পড়ে। মুক্তির বাণীই তাহার হৃদয় মন ভরিয়া তোলে।

আলতাফদের বাড়ির নিকট আলতাফ পানসী হইতে নামিয়া পড়িল।

বেশি দূর নয়, নিকটেই জমিদার বাড়ির ঘাট। অদূরে মিলের বাতিগুলি জ্বলিতেছে।

সীমন্তী স্থমিতের পাশে আসিয়া বলিল, তোমার কী হল?

স্থমিত হাসিয়া বলিল, কিছুত' হয় নি!

: চুপ করে কী ভাবচ?

: বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাহাত্ম্য!

সীমন্তী কোন কথা বলিল না।

খানিকক্ষণের মধ্যে ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল।

স্থমিত নৌকা হইতে ঘাটে নামিয়া সীমন্তীকে হাত ধরিয়া তীরে নামাইল। দুইজনে যখন হাত ধরা অবস্থায় পাড়ে চাহিল তখন রাজনারায়ণ বাবুকে তীব্র দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল।

স্থমিত ভয়ে হাত ছাড়িতে চেষ্টা করিল কিন্তু সীমন্তী হাত ছাড়িল না।

পিতাকে স্থমুখে দেখিয়া স্থমিত সশঙ্কিত ভাবে হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু সীমন্তী হাত ছাড়িল না, স্থমিতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকে নিজের আঙ্গুলগুলি ঢুকাইয়া দিয়া চাপিয়া ধরিল। স্থমিত পিতার কঠোর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, মাথা নত করিয়া চাপা গলায় বলিল, আঃ ছাড়—বাবা!

সীমন্তী মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, এত ভয়ের কারণ? আমি মেয়ে মানুষ ব'লে, না কংগ্রেস সেবিকা ব'লে?

সুমিত পিতাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সীমন্তী অগ্রসর হইবার জন্য সুমিতকে আকর্ষণ করিল।

সুমিত বাধা দিতে পারিল না, সীমন্তীর আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের মত অগ্রসর হইল।

রাজনারায়ণ বসু এতটা প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহারই পুত্র যে একজন স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীর হাত ধরিয়া তাঁহার দিকে আসিতে সাহস করিতে পারে তাহা তিনি কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, পা হইতে চটি জুতা খুলিয়া দুইজনকেই নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহস পাইলেন না। দুইজনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

রাজনারায়ণ বসু ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া পড়িলেন দেখিয়া সীমন্তী একটু হতাশ হইয়া সুমিতের হাত ছাড়িয়া দিল।

সুমিত বলিল, বাবাকে আঘাত দেওয়াই কি তোমার উদ্দেশ্য ছিল?

সীমন্তী মাথা ঝুঁকিয়া বলিল, কতকটা!

: কিন্তু তুমি জান যে, বাবাকে আমি সম্ভ্রম করে চলি।

: সম্ভ্রম করে চল না, অহেতুক ভয় করে চল। এই অহেতুক ভয়ের জন্যে তোমাদের মধ্যে সম্বন্ধ কোনদিন সরল ও মধুর হয়নি।

: বাবাকে আমি ভয় করে চলি বলেই কখনও তাঁর সঙ্গে বসে মন খুলে কোন বিষয়ের আলোচনা করিনে, কখন আলাপও করিনে সত্যি কিন্তু তাই বলে আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারি না। এ কথা তোমায় ভুললে চলবে না যে, আমি ওঁরই পুত্র।

: আমি তোমাদের কৃত্রিম অভিনয়টাই ভেঙ্গে দিতে চাই সুমিত!

: তা' হয় না সীমন্তী! আমার ও তোমার সঙ্গে পিতার প্রায় সকল বিষয়েই আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তিনি যত ছোট নীতিই অবলম্বন করুন না কেন আমাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। পুত্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করতেই হবে।

: তোমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যটা কী?

: সে কি এমনি চট করে মুখে বলা যায়, না কোন আঁকা পথ ধরে সর্ব্বদা চলা যায়!

: পিতার প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কি তা' নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি কংগ্রেসের সেবক বলে আপনাকে ধন্য মনে করবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে কংগ্রেসের আদর্শ ও ধর্ম্ম অন্তরের সঙ্গে মানতেই হবে।

: কংগ্রেসের আদর্শ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন কিছু অভিযোগ নেই' কিন্তু কংগ্রেসের দোহাই দিয়ে কি আমাকে পিতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, পিতাকে আঘাত করবার জন্যে এমনি করতে হবে?

: মতের গরমিল হলে সংঘাত লাগবেই, সংঘাতের ভয়ে কর্ত্তব্যকে এড়িয়ে চলার নীতি কংগ্রেসের নয়, মনুষ্যত্বের ধর্ম্মও নয়। সীমন্তী নদীর পাড়ে উঠিয়া বলিতে লাগিল, তোমার পিতা মুখে যাই বলুন না কেন, তিনি অন্তরে অন্তরে এ কথা ভাল করেই জানেন যে, তোমাকে ভালবাসি ব'লে মিলনের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্রোহ করিনি সুমিত!

: তবে?

: তবে! সীমন্তী হাসিয়া উত্তরটা চাপিয়া গিয়া বলিল, তোমার

মত পুরুষের হাত ধরবার অধিকার পাওয়া নারীর সাধনার প্রয়োজন; সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু এ কথা কখনও ভুল না যে, সীমন্তী কংগ্রেস সেবিকা।

সুমিত সীমন্তীর উক্তিতে আঘাত পাইল কিনা বুঝা গেল না, তবে তাহার পৌরুষ একটু ক্ষুন্ন হইল। সুমিত সীমন্তীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পিতার অপমানে তাহার মনটা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন উত্তর দিতে বা কোন কিছু প্রশ্ন করিতে সে পারিল না। নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

সীমন্তী সুমিতের আঙ্গুলগুলি নিজের আঙ্গুলের মধ্যে জড়াইতে জড়াইতে কোমল স্বরে বলিল, দেখ সুমিত, যে-কোন নারীই হয়ত তোমার পরশে, তোমার সান্নিধ্যে গৌরব বোধ করতে পারে, রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারে কিন্তু সীমন্তীকে তেমনি মনে করে অন্তত তুমি কখনও এত বড় অপমান কর না। তোমাকে প্রকৃত কংগ্রেস সেবক-রূপে যদি পাশে পাই, যদি তোমার হাত ধরে চলতে পারি তবেই শুধু আমি গৌরব বোধ করব, রোমাঞ্চ অনুভব করব। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে আমি অস্বীকার করিনে, যৌবনকেও আমি অপমান করতে চাইনে কিন্তু তার চেয়েও বড় আমাদের দেশসেবা—বিশ্বমানবতা। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং যৌবন ধর্ম্ম যেখানে চরম পরিণতিতে টেনে আনেনি সেখানে তাকে স্বীকার করবার জন্যে কৃত্রিমকে আশ্রয় করার চেয়ে বড় অধর্ম্ম আর নেই—তাতে আত্মা ও মনুষ্যত্বকে ভীষণ অপমান করা হয়।

সুমিত তথাপি কোন উত্তর করিল না—অন্ধকারের দিকে চাহিয়া

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান অন্ধকারই।

সীমন্তীর কুটিরে পৌঁছিয়া সুমিত আজ আর ভিতরে গেল না। দরজা হইতেই বিদায় লইল। সীমন্তীও কোন বাধা দিল না বা চা খাইবার জন্য আহ্বানও করিল না। ক্লান্ত দেহ ও শ্রান্ত মন লইয়া সুমিত ধীরে ধীরে অন্ধকারে পথ ধরিল।

বাড়িতে যাইতে তাহার মন সরিল না। বাড়িতে তাহার কোন আকর্ষণ নাই—কোথাও তাহার আকর্ষণ আছে কিনা মনে পড়িল না—পা দুইটি তাহার অন্ধকারের অন্তরালের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

সুমিত হাঁটিতে হাঁটিতে মুসলমান পাড়ায় চলিয়া আসিল। আলতাফের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল। এতদূর যে সে চলিয়া আসিয়াছে তাহা সে ধারণাই করিতে পারে নাই। অন্ধকারে তাহার হাঁটিতে বেশ লাগিতেছিল। কেহ যদি তাহাকে বাধা না দিত, কখনও যদি তাহাকে না থামিতে হইত তবে বেশ হইত।

কী কঠিন এই সংসার! কী জটিল মানবের ধর্ম্ম আর প্রচলিত ব্যবস্থা! সে কোন পথে যাইবে? একদিকে সমাজ, সংস্কার, বন্ধন ও কর্ত্তব্য, অপর দিকে কংগ্রেসের তীক্ষ্ণ তরবারির মত ধারাল আদর্শ ও নীতি। তাহার মনে হইল, মানুষ মানুষকে যত দুর্ব্বল যত পঙ্গু করিয়া দেয় তেমন আর কেউ পারে না। সে হয়ত পারিত, হয়ত সে অনেক কিছুই করিতে পারে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে হয়ত কিছুই করিতে পারিবে না।

এতদিন সে কোন সঙ্ঘাতেরই সম্মুখীন হয় নাই তাই কোনটা স্বীকার করা উচিত কোনটা অনুচিত তাহা কখনও স্থির করিতে হয় নাই। হৃদয় দিয়াই সে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু আজ প্রথম আঘাতে বুঝিতে পারিল যে, প্রকৃত হৃদয় তাহার কি তাহা সে জানে না, চিনিতেও পারে নাই। আজ হইতে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংগ্রাম সুরু হইল।

আলতাফ সুমিতের পাশে আসিয়া বলিল, আপনি এখানে কি করে এলেন ?

সুমিত একটু মলিন হাসি হাসিল।

আলতাফ সুমিতের উদাস মত ভাবভাবে আশ্চর্য্য হইয়া গেল. ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কারো সঙ্গে রাগারাগি হয়েচে ?

সুমিত মাথা ঝুকিয়া না বলিল।

আলতাফ বলিল, কোন দরকারে—

সুমিত বলিল, না, কোন দরকারে আসিনি।

অপ্রত্যাশিতভাবে ফুলকোয়ারাকে লক্ষ্য করে নাই, আলতাফকে বলিল, অন্ধকারে হাঁটতে ভাল লাগছিল—হাঁটছিলুম। তুমি বাধা দিলে নইলে দূর পৌছুতে পারতুম। বাধা না পেলে হয়ত অন্ধকারে আলোক দেখতে পেতুম। আচ্ছা চললুম।

ফুলকোয়ারা বলিল, দাদা !

আলতাফ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কে, ফুল ! তুই-না দিদি শুয়েছিলি ?

ফুলকোয়ারা বলিল, তোমাদের কথা শুনে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। এত রাত্রে উনি এলেন, ভয়ে, কৌতূহলে থাকতে পারলুম না, উঠে এলুম।

সুমিত বা আলতাফ কোন জবাব দিল না।

ফুলকোয়ারা বলিল, দাদা কি হয়েছে?

সুমিত বলিল, কিছু হয়নি ফুলরাণী, অন্ধকারে বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের বাড়ীর ধারে এসে পড়েছি।

ফুলকোয়ারা একটু অনুযোগের সুরে বলিল, এই গভীর রাতে এমনি অন্ধকারে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে লোকজন নেই। একটা আলোও নেই।

আলতাফ বলিল, এ আপনার বড় অন্যায়। একা একা অন্ধকারে আপনার বের হওয়া উচিত হয়নি।

সুমিত মৃদু হাসিয়া বলিল, এইটুকু পথ অন্ধকারে এসেছি বলে তোমরা অনুযোগ করচ, ভয়ে ফুলের মুখ শুকিয়ে গেচে অথচ আশীষ ও আলতাফ ঝড় বাদল দুর্য্যোগ রাতে কত দুর্গম স্থান অসঙ্কোচে পার হয়ে যায়।

ফুলকোয়ারা শান্তভাবে বলিল, ওদের যা সয় তা' আপনার সয় না। ওরা বোমার যুগের ডানপেটা গুণ্ডা। আইন অমান্য করে পীড়ন অত্যাচার সয়েচে, জেলে পচেছে কিন্তু আপনি ত' এ সব সহ্য করতে পারবেন না।

সুমিত বলিল, না পারলে চলবে কেন ফুলরাণী! ভয়ে যদি না এগুতে চেষ্টা করি তবে যে কলঙ্ক!

ফুলকোয়ারা হাসিয়া বলিল, সরে থাকতে ত' আমি বলিনি। আমি বলছিলুম দেহকে অস্বীকার করে সব কিছু করা যায় না। অপরকে অত্যাচার করা যেমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ, নিজের ওপর অত্যাচার করাতো ঠিক তেমনি অপরাধ।

আলতাফ দুই জনের তর্কের ফাঁকে এক সময় নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তর্কের ঝোঁকে দুই জনের কেহই তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখে নাই।

সুমিত একটা উত্তর দিবার জন্য চেষ্টা করিতেই ফুলকোয়ারা বাধা দিয়া বলিল, গভীর রাত্রে তর্কটা মুলতুবী রইল, অন্য একদিন অবসর মত প্রাণ খুলে তর্ক করা যাবে।

সুমিত হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।

ফুলকোয়ারা অন্ধকারে সুমিতের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি খেয়ে এসেছেন?

সুমিত বলিল, না!

না, ফুলকোয়ারা ব্যস্তভাবে বলিল, এত রাত অবধি না খেয়ে আছেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

: তে'মাথার বিকট বট গাছটার নীচে।

ফুলকোয়ারা যেন শিহরিয়া উঠিল, শঙ্কিতভাবে বলিল, ওই বিশ্রী বট গাছটার নীচে।

সুমিত বলিল, ভয় নেই ভূত আমায় ধরবে না, কারণ ও দেবতার প্রতি আমার মোটেই আস্থা নেই। তুমি ভয় পাচ্ছ ফুল—কিন্তু চমৎকার সে স্থানটি। অন্ধকার নির্জ্জন রাত্রে কখনও যদি সেখানে যাবার তোমার সৌভাগ্য হয় তবে বুঝতে পাবে যে এত চমৎকার, এত মনোরম, পবিত্র স্থান পৃথিবীতে খুব কমই মেলে। কোন দিন যদি সুযোগ হয় তবে আমি তোমায় নিয়ে যাব—অন্তর দিয়ে তাকে অনুভব করতে যেও, নতুবা মহা-শ্মশানের ভূত প্রেত আর অন্ধকারের কুরূপটাই শুধু ধরা

দেবে—ওই পবিত্র স্থানের প্রকৃত রূপ চোখে পড়বে না। আচ্ছা এখন আসি!

ফুলকোয়ারা ব্যস্তভাবে বলিল, এত রাত্রে একা একা যাবেন, দাদা?

সুমিত হাসিয়া বলিল, তোমাকে ভয় পেতে হবে না ফুল, এই দুর্দিনে ভূত আমার পথ আগলিয়ে খেলা করবার ফুরসুত পাচ্ছে না। বেকার সমস্যা, অর্থ সমস্যা, বাঁটোয়ারা সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে নাজেহাল হয়ে গেচে।

ফুলকোয়ারা সুমিতের হাত ধরিয়া বাধা দিয়া এবং একটু আবেগের সহিত জোর দিয়া বলিল, ভূত নয় নেই কিন্তু সাপ, পাগলা শিয়াল, কুকুর—বন্য জীবজন্তু। আপনি একটু দাঁড়ান, একটা আলো এনে দিই।

সুমিত বলিল, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। দৈব দুর্ঘটনাকে মানুষ এড়াতে পারে না। অদৃষ্টকে আমি মানি। জন্তুতে যদি আমার মরণ হয় তবে তোমাব আলো ও লাঠিতে আটকাবে না। গুড্ নাইট্।

সুমিত হন্ হন্ করিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ফুলকোয়ারা অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি প্রসার করা চলে ততটুকু দৃষ্টি-নিবদ্ধ কবিয়া চাহিয়া রহিল।

আলতাফ একটা টর্চ লাইট ও একটা লাঠি হাতে নিয়া আসিল। ফুলকোয়ারা আলতাফকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, দাদা উনি অন্ধকারেই চলে গেলেন। তুমি শিগ্‌গির যাও—দেরি করোনা—একেবারে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এসো ভাই!

আলতাফ কোন কথা বলিল না, দ্রুত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

ফুলকোয়ারা নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গিয়া শুইতে পারিল না। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আলতাফের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুমিতের সঙ্গে মাঝ পথে তাহাদের দারোয়ানের দেখা হইল। তাহাকে খুঁজিবার জন্যই দারোয়ানকে পাঠান হইয়াছে।

সুমিত দারোয়ানকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে, সুলেখা তাহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়াছে এবং রাজনারায়ণ বাবু অনেকক্ষণ তাহার প্রতীক্ষা করিয়া শয্যা নিয়াছেন।

সঙ্গে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই দেখিয়া আলতাফ মাঝ পথ হইতেই ফিরিয়া গেল।

সুমিত যখন বাড়িতে পৌঁছিল তখন ঢং করিয়া বড ঘড়িতে একটা শব্দ হইল। একটি মাত্র শব্দ হওয়ায় সুমিত সময়ের কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। লণ্ঠনের আলোকে হাত ঘড়িতে দেখিল রাত্রি দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে।

রাজবাড়ি নীরব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গ্রামখানি বহু পূর্বেই নীরব হইয়া গিয়াছে, কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। দূরে ফ্যাক্টরীতে কাজ চলিতেছে। কারখানার একঘেয়ে বিশ্রী শব্দ অস্পষ্ট ভাবে শোনা যাইতেছে। কৃষ্ণপক্ষ রজনী—গাঢ় অন্ধকার, নিথর, নিস্তব্ধ।

সুমিত উঠানে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার পিতা ঘুমান নাই। দরজা ভেজান আছে কিন্তু এখনও আলো জ্বলিতেছে। সুমিত পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দায় উঠিয়া আসিল এবং পিতাকে এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেই আকস্মিকভাবে রাজনারায়ণ বাবুর ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। সুমিত পালাইতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাজনারায়ণ বাবু প্রশ্ন করিলেন—কে ?

গম্ভীর কঠোর স্বরে সুমিত একটু ভয় পাইয়া গেল। সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সুলেখা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া পিতার হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আর নয় অনেক রাত হয়েচে, এবার শুতে চল।

রাজনারায়ণ বাবু কোন উত্তর করিলেন না, তীব্র দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুলেখা পিতাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, বাবা, দেড়টা বেজে গেচে, যা তোমার বলবার আছে তা তুমি কাল বল, আজ নয়, না, বাবা এখন চল।

সুলেখা তো একরূপ জোর করিয়া রাজনারায়ন বাবুকে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে রাজনারায়ণ বাবুর কক্ষের আলো নিভিয়া গেল।

সুমিত সটান নিজের ঘরে গিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় বসিল। তাহার মনের ভিতর এমন ঝড় বহিতে লাগিল যে মনে হইল এখনই বুঝি সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার চিত্ত আকুল হইয়া পড়িল। সে এমন কি অন্যায় করিয়াছে যাহার জন্য তাহার এই উৎকণ্ঠা!

সুমিত আর ভাবিতে পারিল না। এবার বাহিরের খোলা জানালা দিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দূরে একটা কাক ঝট্‌পট্‌ করিয়া আবার চুপ করিল। পাশের

ঘরে সুলেখার দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনিতে পাইল। তাহার সামনে একটি টিকটিকি দুইবার মাথা নাড়িয়া কি এক ইঙ্গিত করিয়া সুমিতের পানে তাকাইয়া রহিল।

সুমিত বিছানায় আসিয়া বসিল। মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের মধ্যে যদি একটুও পাপ আসিয়া থাকে, যদি বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম না জাগিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার উপর ভগবানের এমন অভিশাপ পড়ুক যেন সে নিমেষে নিঃশেষ হইয়া যায়।

সুমিত আর ভাবিতে পারিল না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুমিত বহুক্ষণ পিতার আহ্বানের প্রতীক্ষা করিয়াছে। একটু বেলা করিয়াই সে শয্যা ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু দ্বিপ্রহর হইতে চলিল এখনও পর্য্যন্ত রাজনারায়ণ বাবুর নিকট হইতে কোন জরুরী আদেশ আসে নাই এমন কি সুলেখাও এমুখী হয় নাই। সুলেখা হয়ত' প্রত্যুষে একবার আসিয়া থাকিবে, হয়ত' পুরাতন অভ্যাস মত একবার তদন্ত ও তত্বাবধান করিয়া গিয়াছে কিন্তু এতখানি বেলা হইল তবু সে আর এদিকে আসিবার অবকাশ পায় নাই, কোন প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

সুমিত আর বসিয়া থাকিতে পারে না। কি অপরাধ সে করিয়াছে যাহার জন্য সকলেই তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছে? এই নিষ্ক্রিয় মনোভাব দিয়া পীড়ন করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ পাইয়া সে পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু ঝড়ও আসিল না এবং ঝড়ের লক্ষণও কাটিল না, ববং আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার মনে হইল, সীমন্তী সত্য কথাই বলিয়াছে, পিতা পুত্রের মধ্যে কৃত্রিম সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। ভুলের উপর ভিত্তি করিয়া হয়ত কত পর্ব্বত প্রমাণ অভিযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা অতি সহজেই মীমাংসিত হইয়া যাইতে পারে। ভুল হয়ত সে করিয়াছে, তাহার পিতাও ভুল করিয়াছেন কিন্তু ভুলকে প্রতিপালন করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? তাহাকেই ইহার মীমাংসা করিতে হইবে, তাহাকেই ভুলের বোঝা লাঘব করিতে হইবে। রাজনারায়ণ বাবু অথবা সুলেখা ইহার মীমাংসা করিবে না, তাহার নিষ্ক্রিয় মনোভাব দ্বারা পীড়নই করিবে।

সুমিত আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, এবং এই বিশ্রী পরিস্থিতিব একটা হেস্তনেস্ত করিবার উদ্দেশে সুলেখার সন্ধানে চলিল। তাহার আজ দৃঢ় প্রতীতি হইল যে সত্য যত নির্ম্মম যত কঠিনই হউক না কেন সত্যকে প্রকাশ করা উচিত। এবং প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদও মঙ্গল তবু কৃত্রিম মিলনের দুর্ব্বলতার জন্য অভিনয় করা উচিত নয়।

সুমিত সুলেখার ঘরের পাশে আসিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে ডাকিল, সু, আসব ভাই!

সুলেখা বিছানায় শুইয়া পড়িতেছিল, সেই অবস্থাতেই বলিল, কে, দাদামণি ভাই, এস!

সুমিত ভিতরে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিল। সুলেখা আঙ্গুল দিয়া বইয়ের পাতা মুড়িয়া সুমিতের দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিয়া রহিল। কোন কথা কহিল না।

সুমিত এতক্ষণ অনেক কথাই ভাবিয়া আসিয়াছে কিন্তু সুলেখার সম্মুখে আসিয়া কথার খেই হারাইয়া ফেলিল। সুলেখা যদি এমনিভাবে চুপ করিয়া না যাইত কিংবা বাজে কথাও পাড়িত তবে সে কাজের কথা তুলিবার অবকাশ পাইত। তাহার মনে হইল সুলেখা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছে।

এমনি চুপচাপ বসিয়া থাকিতে সুমিতের কেমন বিশ্রী বোধ হইতে লাগিল। তাই লজ্জাকর অবস্থাটি এড়াইবার জন্য গতকল্যের সংবাদ-পত্রটি টানিয়া লইল। পত্রিকার আড়াল হইতে সুমিত দেখিতে পাইল সুলেখা তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, চাহনিতে মনে হইল যে, সুলেখা সেদিনের আঘাত আজও ভুলিতে পারে নাই এবং তাহারই শোধ

তুলিবার জন্য এমনিভাবে নীরব রহিয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ভাব দেখাইতেছে।

সুমিত আর চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারিল না। পত্রিকার আড়াল হইতে প্রশ্ন করিল, বিবেকানন্দ বাবুর কোন খবর পেয়েচিস, সু?

সুলেখা একটু শ্লেষ দিয়া বলিল, ওঁর কথা তোমার মনে পড়ে?

: না, সকল সময় মনে পড়ে না। এবং সকল সময় মনে পড়বারও কোন কারণ দেখচি না। তা যাক শুনছিলুম শরীর নাকি তেমন ভাল নয়, ছুটি নিয়ে এখানে আসচে। কবে আসবে, সে সম্বন্ধে কিছু লিখেচে?

: আসচে সপ্তাহে আসতে পারেন।

: ছুটি মঞ্জুর হয়েচে তবে?

: স্পষ্ট কিছু লেখেন নি, তবে চিঠির ধরণে মনে হল ছুটি মঞ্জুর হয়েচে।

: পাহাড়ি জায়গা, এখানে কিছুদিন থেকে গেলে বেশ ভাল হবে বলে মনে হয়।

সুলেখা কোন কথা বলিল না, ইচ্ছা করিয়াই চুপ করিয়া গেল। সুমিত আবার ফাঁপড়ে পড়িয়া গেল। কথা থামিয়া গেল, এখন সে কোন সূত্র ধরিয়া আসল কথা পাড়িতে পারে। অথচ আর চুপ করিয় থাকা যায় না একটা মীমাংসা হওয়া উচিত।

সুমিত একটুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বলিল, সু, আমার কয়েকটা কথা বলবার ছিল।

: কথা! তোমার আবার কি কথা? সুলেখা এমনভাবে বলিল যেন সে আকাশ হইতে পড়িল।

: কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচারিকা আসিয়া বলিল, দিদিমণি, কর্ত্তা তোমাকে ডাকচেন।

সুলেখা পিতার আহ্বান শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সুমিতকে বলিল, তোমার কি খুব জরুরী কথা ছিল?

সুমিত ক্ষুব্ধ অভিমানে বলিল, না।

সুলেখা মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। সুমিত বসিয়া রহিল; মনে মনে ভাবিল, এই প্রশ্নটা আগে করিলে কি দোষ ছিল। প্রতিপক্ষ হইতে প্রশ্ন হইলে তাহার পক্ষে কত সুবিধা হইত এবং এতক্ষণে হয়ত ইহার একটা মীমাংসা হইয়া যাইত।

সুমিত যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিল না আলস্যের মাদকতায় বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ হইল সুলেখা গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। সুমিতের মনে হইল সুলেখা পিতার সঙ্গে বসিয়া নিশ্চয়ই তাহাদের সম্বন্ধে কোন পরামর্শ করিতেছে। আজ সুমিতের প্র থম অভিমান জাগিয়া উঠিল। মনে হইল পিতা ও কন্যার পরামর্শে তাহার কোন স্থান নাই, পূর্ব্বেও তাহার কোন স্থান ছিল না। এতদিন তাহাকে শিশু করিয়া রাখা হইয়াছিল। কোন বিষয়ে তাহার মতামতের প্রয়োজন হয় নাই; আর আজ তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পিতা ও কন্যার কত গোপনীয় পরামর্শ হয়। সুমিত ক্ষুব্ধ অভিমানে একটু অপমানেরও ক্লেশ পাইল।

সুমিত আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, ক্ষুব্ধচিত্তে নিজের ঘরে চলিয়া আসিল।

অপরাহ্নে সুমিত ইচ্ছা করিয়াই খাবার না খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পরিচারিকাকে দিয়া সুলেখা বারবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছে কিন্তু সুমিত শরীর ভাল নয় অজুহাতে না খাইয়া চলিয়া আসিল. সুলেখার আহ্বানেও দাঁড়াইল না।

পথে সুমিতের সঙ্গে আশীষের দেখা হইল।

সুমিত প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্ছ ?

আশীষ বলিল, দেরী দেখে আপনার খোঁজে যাচ্ছিলুম। আশীষ মোড় ঘুরিয়া বলিল, এদিকে চলুন, দিদি বটগাছটার নীচে প্রতীক্ষা করচেন।

সুমিত একটু লজ্জিতভাবে বলিল, আজ যে বামুন পাড়া, ছলিমপুর যাবার কথা ছিল তা' আমার একেবারেই মনে ছিল না।

বামুনপাড়া যাইবার জন্য সীমন্তী, আলতাফ বট গাছটার নীচে সুমিতের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুমিত ও আশীষ আসিয়া পৌছিলে তাহারা পদব্রজে গন্তব্য স্থান অভিমুখে চলিল।

সুমিত ভাবিয়াছিল, সীমন্তী হয়ত কোন অভিযোগ করিবে, কিন্তু সীমন্তী কোন কথাই বলিল না, গম্ভীরভাবে সকলের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

সকলেই নিঃশব্দে চলিয়াছে শুধু আশীষ একা একাই বকিয়া চলিয়াছে। কেহ তাহার কথা শুনিতেছে কিনা সেদিকে তাহার কোন লক্ষ্য নাই। একা একা বলিয়া যাওয়া তাহার স্বভাব, তাই সে বলিয়া চলিয়াছে। কেহ তাহার কথা শুনিতেছে কিনা সেদিকে যেমন তাহার কোন লক্ষ্য থাকে না তেমনি লক্ষ্য পড়িলেও কেহ শুনিতেছে না বলিয়া কোন অভিমান হয় না।

আলতাফ সুমিতকে জিজ্ঞাসা করিল, কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ছিলেন বলে আপনাকে অনুযোগ শুনতে হয়নি ত ?

সীমন্তী আড়চোখে সুমিতের মুখের দিকে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া লইল।

সুমিত বলিল, মুখে কেউ কিছু বলেন নি, 'তবে ভাবে অনেক কিছুই বলেচেন। ওরা অহিংস ও non-intervention policy নিয়েচেন বলে আভাষ দিয়েচেন, কিন্তু শিগ্‌গিরই হিংস ও oppressive policy গ্রহণ করবেন বলে আমার মনে হ'চ্চে।

আলতাফ হাসিয়া বলিল, আমার বাবাও ultimatum দিয়েচেন। হয়ত দু'তিন দিনের মধ্যে একটা চরম নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এদিকে আপনার বাবা, ফ্যাক্টরীর পরিচালকবর্গ এবং আমার বাবার মত ছোট ছোট মহাজনদের এক গোপনীয় বৈঠক হয়ে গেচে—পুলিশের সাহায্যে শিগ্‌গিরই আমাদের উচ্ছেদ করা হবে। কম্যুনিজমের ধুয়ায় অহিংস [illegible] ত গুলিয়ে যাবে।

সুমিত ব্যস্তভাবে সীমন্তীকে বলিল, এত জটিল পরিস্থিতি আর তুমি বেশ নির্ব্বিকার আছ।

সীমন্তী অতি স্বাভাবিক স্বরে বলিল, ব্যস্ত হবার ত' কিছু নেই।

সুমিত ব্যস্তভাবে বলিল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই—বল কি? গোড়াতেই আমাদের সম্মিলিত শক্তিতে বাধা দেওয়া উচিত। আমি মনে করি, অবিলম্বে আমাদের দাবীগুলি উত্থাপন করা উচিত।

সীমন্তী বলিল, কৃষকদের দাবী পেশ করতে হবে তোমার বাবার নিকট, আর শ্রমিকদের দাবী যদিও ফ্যাক্টরীর মালিকদের নিকট করতে হবে; কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তোমার বাবার নিকটই দাবী করা হবে। তোমার প্রস্তাব মত যদি আমরা দু'টি বিষয়েই ultimatum দিই এবং দাবিগুলি যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তুমি সংগ্রাম করতে পারবে? চ্যালেঞ্জ

করতে চাও ভাল, কিন্তু ওরা যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংগ্রাম করতে পারবে ?

সুমিত বলিল, পারব !

সীমন্তী বলিল, তোমার বাবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবে ? যদি পার তবে congratulate your courage.

আলতাফ বলিল, দিদি এখনই কোন মতামত স্থির করে বস না, গভীরভাবে ভাববার আছে কিন্তু—

আশীষ বলিল, এতে ভাববার কিছু নেই। আমার দু'শো স্বেচ্ছাসেবক আছে, ওরা শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য জীবন দান করতে কুণ্ঠিত হবে না। একবার প্রস্তাবটা গ্রহণ করে আদেশ দাও, শক্তি পরীক্ষা হোক।

সীমন্তী বলিল, এখন এ সম্বন্ধে কিছু মতামত দেওয়া যায় না। রবিবারের অধিবেশনে সকলে মিলে একটা সিদ্ধান্ত করা যাবে।

আশীষ বলিল, তোমার আদেশই কংগ্রেসের আদেশ দিদি !

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, তা কি করে হবে ? কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ইহার গঠনতন্ত্র আমাকে মেনে চলতেই হবে। আমি এখানকার সমিতির সভাপতি সত্য, কিন্তু সভাপতির ডিক্‌টেটরী ক্ষমতা নেই। আমার প্রতি তোমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে এবং তোমাদের অন্ধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ক্রমশঃ আমাকে ডিক্‌টেটরের আসনে ঠেলে নিচ্ছে, কিন্তু তাই বলে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত সেবিকা হিসাবে আমি ত' ডিক্‌টেটর হতে পারি না। আমাকে গণতন্ত্র মানতেই হবে।

সুমিত মুহূর্ত্তের জন্য সীমন্তীর দিকে তাকাইয়া বলিল, appricciate your spirit.

সুমিতের কথায় কেহ বিশেষ কান দিল না, কিন্তু সীমন্তী চমকাইয়া উঠিল। সুমিতের ব্যক্তিত্বের গভীরতা কতটুকু দেখাইবার জন্য তীব্র দৃষ্টিতে সুমিতের দিকে চাহিল।

সুমিত বলিল, কৈ, কাউকে ত' দেখচি না। তোমরা বলেছিলে, গ্রামের লোক কত ভাল—গ্রাম শুদ্ধ সকলেই মাঝপথ পর্য্যন্ত চলে আসে অভ্যর্থনা করতে। অথচ গ্রামের ধারে চলে এলুম, ছেলেমেয়েদের দেখা যাচ্চে না!

আশীষ বলিল, তাই ত' অন্যান্যবার গ্রামের ছেলেমেয়ে সব হৈ চৈ করতে করতে অনেকটা পথ এগিয়ে থাকত, গ্রামের বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ মাথার বাড়িটিতে এসে জটলা করত, আর আজ কাউকেই দেখা যাচ্চে না—কেমন কেমন মনে হচ্ছে কিন্তু!

আলতাফ বলিল, non-intervention policy নিলেন।

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, কাকাবাবুও কি অহিংস non-intervention policy নিলেন।

রাস্তা পর্য্যন্ত কেহই অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল না। গ্রামের মোড়ে আসিলে পূর্ব্বোক্ত মাষ্টার মশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সীমন্তী সহাস্যে মাষ্টার মশাইকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল, ভাল আছেন?

মাষ্টার মশাই সীমন্তীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ভালই আছি মা! অনশন, দুঃখকষ্ট আর নির্য্যাতন সয়ে দেহটা পোড়া কাঠ হয়ে গেচে, সহজে কোন কিছু আর কাবু করতে পারে না।

আলতাফ মাথা নত করিয়া সেলাম করিল, আশীষ পা ছুঁইয়া প্রণাম

করিল। সুমিত মাষ্টার মশাইকে চিনে না, আজ এই প্রথম তাহাকে দেখিল। সকলকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সে নিজেও টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন, একে ত' চিনলুম না, ইনি কে?

আশীষ উত্তর করিল, ইনিই এখানকার জমিদারের একমাত্র পুত্র। এঁরই কথা আপনাকে বলেছিলুম, এঁর নাম শ্রীসুমিত বসু। ইনি উচ্চ শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক; এই অল্প বয়সেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ঘুরে এসেচেন। সুমিত বাবু শুধু highly cultured নন্; বীর, কর্ম্মঠ ও অতিশয় দয়ালু।

মাষ্টার মশাই সস্নেহে বলিলেন, সুমিত বাবু, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুসী হলুম। এঁরা সকলেই আপনার এত সুখ্যাতি করেন, অথচ দেখা করবার প্রবল আকাঙ্খা সত্ত্বেও সে সৌভাগ্য হয়ে উঠেনি।

সুমিত বলিল, আপনারা সকলেই যদি এমনিভাবে কথা বলেন তবে আমার কথা বলবার উপায় থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়েচি, দেশবিদেশও ঘুরেচি কিন্তু কংগ্রেসের সেবক হবার যে সৌভাগ্য লাভ করেচি সেটাই কি এ সকলের বড় নয়। আমার এই উক্তিটি যদিও অকৃত্রিম তবু সীমন্তী দেবীর প্রতিধ্বনি মাত্র। সীমন্তী দেবী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, অতএব তাঁর অভিমত ও বিশ্বাস অনুসারে ব্যক্তিগত পরিচয়টা কি অতিরিক্ত বলে আমাদের মনে করা উচিত নয়?

মাষ্টার মশাই একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তাই ত' ত্রুটি হয়েচে। আমাদের ত' জাত ধর্ম্ম, পদমর্য্যাদা প্রভৃতির বালাই রাখতে নেই।

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, আপনার লজ্জিত হবার বিশেষ কিছু নেই।

অকৃত্রিমভাবে লোকের প্রশংসা করতে পারা কম ভাগ্যের কথা নয়। চলুন, আর দেরী করে লাভ নেই।

মাষ্টার মশাই ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ মা চল, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

আলতাফ বলিল, মাষ্টার মশাই, গ্রামের কাউকেই দেখছি না কেন? ছেলেমেয়েরাও কি আমাদের খবর পায়নি?

মাষ্টার মশাই লজ্জিতভাবে বলিলেন, গরীব গৃহস্থরা জমিদার ও পুলিশকে ভয় পায়।

সুমিত বলিল, বাবা নিষেধ করেছেন?

মাষ্টার মশাই বলিলেন, ঠিক নিষেধ করেন নি, হুমকি দিয়েছেন। সে অনেক কথা আছে, পরে সব বিষয় আলোচনা করা যাবে।

সীমন্তী হাত ঘড়িতে সময় দেখিয়া বলিল, আজ রওনা হতে বড় দেরী হয়ে গেছে। আশীষ ও আলতাফ ভাই, তোমরা এখানে আর অপেক্ষা না করে ছলিমপুর চলে যাও, আমরা যদি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারি তবে ছলিমপুর যাব নইলে এখান থেকেই বিদায় নেব। আটটার মধ্যে যদি না যেতে পারি তবে আর অপেক্ষা কর না, কাকাবাবুর বাড়ি হয়ে যেও অপেক্ষা করব।

আলতাফ ও আশীষ ছলিমপুরের দিকে চলিয়া গেল।

মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে সীমন্তী ও সুমিত মাষ্টার মশাইয়ের কুটিরে আসিল। ছোট্ট একখানি বাড়ি। ঘর, উঠান সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানের একধারে ছোট্ট একটি বাগান, ঠিক বাগান বলা চলে না, মাত্র কয়েকটি যুঁই, বেলা, গাঁদা, রজনীগন্ধার চারা সযত্নে রোপণ করা হইয়াছে। এখনও

চারাগুলি বড় হয় নাই। মাষ্টার মশাইয়ের শয়ন ঘরের দরজার পাশেই দুইটি গোলাপ গাছ। গাছ দুইটি বড় হইয়াছে, সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে।

সুমিত বলিল, মাষ্টার মশাই আপনার বাড়িটি ভারি সুন্দর!

মাষ্টার মশাই লজ্জিত হইয়া বলিলেন, গরীব মানুষ, সংসারে দেখা শোনা করবার কেউ নেই, কোন ভাবে বেঁচে আছি।

সীমন্তী সোহাগ করিয়া বলিল, আমি ত' বহুবার বলেছি আমায় পুষ্যি নিন। আমি সব দেখা শোনা করব।

মাষ্টার মশাই সীমন্তীকে বুকে টানিয়া সস্নেহে চিবুক নাড়িয়া বলিলেন, ভগবান এই রত্নকে কি ঘর সংসার করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন!

মাষ্টার মশাই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, চোখ দুইটি তাঁহার সজল হইয়া উঠিল।

সীমন্তী বলিল, এত কোমল প্রাণ নিয়ে আপনি কি করে দুষ্টের দমন করেছিলেন, কি করে ডাকাতি করতেন, মানুষ খুন করতেন আমি ভেবে পাইনে কাকাবাবু!

মাষ্টার মশাই সীমন্তীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তখন হয়ত এমন ছিলুম না। যৌবনের উদ্দীপনা ছিল, দৃঢ়তা ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সে দৃঢ়তা আর নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়াই—

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, এটা ত' নিছক যুক্তি, আসল কথা ত' আপনি আমায় সুখী করতে চান।

মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন, আমি নিজে আইবুড়ো, তাই আইবুড়োদের দুঃখ বুঝ • পারি। মেয়েদের একটা বয়স আসে যখন তাদের বিয়ে করা উচিত। সীমন্তী হাসিয়া বলিল, আমার ত' সে বয়স কেটে গেছে,

কাকাবাবু, এখন ত' এ সমস্যা আর উঠতে পারেনা। আপনি সুমিতের সঙ্গে আলাপ করুন, আমি একবার পাড়াটা ঘুরে আসি। সুমিত, তুমি কাকাবাবুর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলতে পার।

সীমন্তী চলিয়া গেলে মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন, সীমন্তীর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

সুমিত বলিল, মাস তিনেকের। আপনি আমাকে তুমি বলেই সম্বোধন করবেন।

মাষ্টার মশাই হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিই বলব। সীমন্তীর সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাব হয়েচে—না হয়েও উপায় নেই। অদ্ভুত মেয়ে, একবার যার সঙ্গে পরিচয় হবে তার আপন না হয়ে উপায় নেই। বাইরে থেকে কাঠখোট্টা নীরস মনে হবে; মনে হবে ও অতিশয় দৃঢ়, ভয়ঙ্কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' নয়। ছোট বেলা থেকেই আমি ওকে জানি, আমি ওর গৃহশিক্ষক ছিলুম। সীমন্তী যখন সন্ত্রাসবাদী ছিল তখন কত নির্ম্মম, কত নিষ্ঠুর কাজ সে করেচে। আমরা পুরুষরা পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে যেতুম। ওর দৃঢ়তা ও বীরত্ব দেখে মনে হ'ত পুরুষ মানুষও এত নির্ম্মম, এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ হতে পারে না। মানুষ খুন করেও সীমন্তীকে অনুতাপ করতে দেখিনি, অথচ ওই সকলের চেয়ে বেশী দুঃখ পেত, অজস্র চোখের জল ফেলেও শান্ত হতে পারত না। কর্ত্তব্য হতে সে এক তিল বিচ্যুত হত না, কিন্তু হতভাগাদের জন্য ওই বেশি দুঃখ করত। মা আমার অদ্ভুত মানুষ—অদ্ভুত!

সুমিত কোন কথা বলিল না, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাষ্টার মশাই বলিয়া চলিলেন, সীমন্তী আমার সঙ্গেই ঘুমোত। ছোট

শিশুর মত সে আমার বুকে লুকিয়ে থাকত। কোন কোন রাত ভয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত, মনে হত নিথর নিস্পন্দ রাত্রি যেন রোদন করচে। অভিভূতের মত তাড়াতাড়ি সীমন্তীকে বুকে চেপে ধরে বলতুম, মা, মা, কেন অমন করে কাঁদচিস। মা আমার কোন উত্তর দিত না, শুধু শুধু আমার বুকে মাথা গুঁজে কাঁদত। সুমিত, মা আমার যাদের পীড়ন করেচে, যাদের শাস্তি দিয়েচে তাদের জন্যই সারারাত কেঁদেচে। মানুষ শুধু ওর নিষ্ঠুরতা ও হৃদয় হীনতার কথাই জেনেচে কিন্তু ওর সত্যিকারের পরিচয় জানেনি।

সুমিত বড় আম গাছটার নীচে দাঁড়াইয়া বলিল, সীমন্তী দেবী তখনও কাঁদতেন, আজও কাঁদেন। আমি জানি উনি নির্য্যাতিত, নিপীড়িত হতভাগ্যদের জন্য শিশুর মতই কাঁদেন।

হৈ হৈ করিতে করিতে সীমন্তী এক পাল ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌছিল।

সীমন্তী হাসিয়া প্রশ্ন করিল, নির্জ্জনে অত কি পরামর্শ হচ্চে?

মাষ্টার মশাই হাসিয়া উত্তর করিলেন, পরামর্শ নয়, দুর্ণাম করছিলাম।

সীমন্তী বলিল, কার দুর্ণাম? আর যাই করুন আমার দুর্ণাম করবেন না যেন, এ বিষয়ে আমার বড় উইক্‌নেস আছে। সুমিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তুমি ত' জান নামের জন্য আমি তদ্বির করি।

সুমিত বলিল, নামের মোহ যদি তোমার থাকত তবে তুমি পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসতে না সীমন্তী।

সীমন্তী ছেলেমানুষী করিয়া বলিল, বানানো কথা। আমার যদি টাকা থাকত আর দল থাকত তবে কি সহর ছেড়ে এখানে আসি। বিশ্বাস না

হয় আমায় নিয়ে শহরে চল, দল গড়বার জন্যে অকাতরে টাকা দেবে, দেখো আমি কেমন ফিল্ড তৈরি করে নিই।

সুমিত বলিল, বেশ চল!

সীমন্তী বলিল, সাহস পাবে, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করতে আর আমার খরচ যোগাতে?

সুমিত সত্যই সীমন্তীর খুশী মত টাকা যোগাড় করিতে পারিবে না, তাই চুপ করিয়া গেল। মাষ্টার মশাই কোন কথা বলিলেন না. নীরবে শুধু কৌতুকের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

সীমন্তী ছেলেমেয়েদের বলিল, চল তোমাদের স্কুল ঘরে, দেখি তোমরা কতটুকু পড়েচ!

মাষ্টার মশাই বলিলেন. তোমরা যাও, আমরা এক্ষুনি আসচি।

সীমন্তী সদলে প্রস্থান করিল। মাষ্টার মশাই মেয়েদের দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু তাহাদের কোন কথা বলিলেন না। সুমিতের নিকট মাষ্টার মশাইয়ের চাহনিটা যেন কেমন বিসদৃশ মনে হইল।

অপরাহ্ন!

বড় বড় গাছের ডালপালা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ডাল পালায়, পাতায় শাখায় একটা জমাট স্নিগ্ধ মধুর ছায়া চারিদিকে ওতঃপ্রোতভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের রঙিন আলোচ্ছটা উন্নত সবুজ উষ্ণীষে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কচি পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশের হাসি বিলাইয়া দিতেছে। স্নিগ্ধ, মধুর, সুন্দর!

সমস্ত কিছুই সবুজ, সমস্ত কিছুই সুনীল। ছোট ছোট ঘরের উপর বৃহৎ আম গাছটার ডাল চলিয়া গিয়াছে, সমস্ত ঘরটার উপর কত শাখা

প্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুমিতের মনে হইল আম গাছটি যেন কুঁড়ে ঘরগুলিকে আশ্রয় দিয়াছে।

মাষ্টার মশাই বলিলেন, চল!

সুমিত মুগ্ধ হইয়া মাষ্টার মশাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি। দীর্ঘ-শুভ্র শ্মশ্রু আবক্ষ পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে, মাথার কোঁকড়ান বড় বড় চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, শরীরের রঙ, উজ্জ্বল গৌর। সুমিতের মনে হইল, সে যেন ঋষি বাল্মিকীকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে। ইহাই যেন বাল্মিকীর আশ্রম। ছোট্ট বিচালীর ঘর, রাঙা মাটি দিয়া বেড়াগুলি লেপা, চারিপাশে অসংখ্য কত ছোট ছোট ও বড় বড় গাছ। ঘন সবুজতা, নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা স্বর্গীয় ভাব ছড়াইয়া রহিয়াছে।

মাষ্টার মশাই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, চল স্কুল ঘরে যাই।

সুমিত কোন কথা বলিল না, অভিভূতের মত পিছনে পিছনে চলিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ভারি সুন্দর, ভারি পবিত্র—ইহা যেন সত্যিকারের বাল্মিকীর আশ্রম।

স্কুল ঘরে আসিয়া দেখা গেল ছেলেমেয়েরা সীমন্তীকে ঘিরিয়া পড়িতে বসিয়াছে। একেবারে সাধারণ ব্যাপার! মেঝেতে বড় একটা চাটাই বিছান। একধারে একটি হাতল ভাঙ্গা চেয়ার ও চেয়ারের পাশে একটি কাল বোর্ড।

সীমন্তী চেয়ারে বসে নাই। চাটাইয়ের মাঝখানে বসিয়াছে। এবং সীমন্তীকে ঘিরিয়া ছেলেমেয়েরা বসিয়াছে। অনেকদিন পরে সীমন্তী আসিয়াছে, সেজন্যই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে কিছুতেই মন

বসিতেছে না, আদর আব্দারে সীমন্তীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

মাষ্টার মশাই ও সুমিত মুগ্ধদৃষ্টিতে সীমন্তী ও ছেলেমেয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাষ্টার মশাই আস্তে আস্তে বলিলেন, সীমন্তীর কোলে ছোট ছোট শিশুদের মানায় ভাল।

সুমিত বলিল, তা' মানায়, তবে ও যখন চওড়া লাল পাড়ের খদ্দরের শাড়ী পরে লাল ঝাণ্ডা উঁচু করে উন্নত শিরে দাঁড়ায় তখন আমাদের অভিভূতের মত সশ্রদ্ধভাবে মাথা নত করতে হয়। তখন আমি দেবী ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারি না।

সীমন্তীর প্রশংসায় মাষ্টার মশাইয়ের চোখ দুইটী আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুমিত বলিল, চলুন আমরা গ্রামটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

মাষ্টার মশাই বলিলেন, হ্যাঁ চল।

সীমন্তী হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবার পরামর্শ হচ্চে?

সুমিত বলিল, তোমার ছাত্র ছাত্রীদের বাপ মার সঙ্গে পরিচয়টা করে আসি।

সীমন্তী বলিল, আজ থাক!

মাষ্টার মশাই প্রশ্ন করিলেন, আজ থাক কেন—কেউ কিছু বলেচে নাকি?

সীমন্তী বলিল, আমার সুমুখে বলতে সাহস পায়নি, তবে আভাষে বুঝতে পারলুম যে ওরা আর আমাদের চায় না।

সুমিত বলিল, কারণ?

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, আমাদের সঙ্গে লোকে মিশতে ভয় পায়। সাম্রাজ্যবাদের কথা এরা বুঝতে পারে না, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও এদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই শুধু ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ রয়েচে। এরা গৃহস্থ, চাষী-মজুর তাই জমিদারকেই মানে, ভয় করে, আমাদের বিশ্বাস করে না। জমিদারের নিষেধ অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি বা সাহস এদের নেই। চাষী মজুররা সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্ত বস্তুতান্ত্রিক।

সীমন্তীর কথার পর আর কোন প্রশ্ন করা চলে না। সুমিত বাধ্য হইয়াই চুপ করিয়া গেল। এর পর কথা কহিতে গেলে তাহার পিতার বিরুদ্ধেই কথা কহিতে হইবে। সীমন্তী হয়ত অপ্রিয় সত্য বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে কিন্তু তাহার আর লজ্জার সীমা থাকিবে। দুর্ব্বলতা বশতঃ সুমিত চুপ করিয়াই গেল, আর কোনরূপ প্রশ্ন করিল না।

মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে সুমিতের ভারি ভাব হইয়া গিয়াছে। সুযোগ পাইলেই সুমিত মাষ্টারমশাইয়ের নিকটে চলিয়া আসে। স্কুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জমিদারের ভয়ে এখন আর কোন অভিভাবক ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠায় না। জমিদার জেদ করিয়া পাশেই একটা পাঠশালা করিয়া দিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা নূতন স্কুলে পড়ে, মাষ্টার মশাই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নির্জ্জন ও ছায়াবহুল বেদীতলে বসিয়া থাকেন। সারা দিনমান কোন কাজ নাই, কেবল বসিয়া থাকা, আর আকাশ-পাতাল চিন্তা করা।

সুমিত সুযোগ পাইলে চলিয়া আসে। মাষ্টারমশাইকে শুধু তাহার ভাল লাগে না, মাষ্টারমশাইয়ের নির্জ্জন বাড়ীর আবহাওয়াটাও তাহার ভারি ভাল লাগে। স্কুলটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সুমিতের মাষ্টারমশাইয়ের

জন্য ভারি দুঃখ হয়। এখানকার স্কুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অন্যত্র স্কুল হইবে। নূতন ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখিতে আসিবে কিন্তু মাষ্টারমশাই আর এদের পাইবেনা। যাদের একবার ভালবাসিয়াছেন তাদের আর ভালবাসিয়া আদর যত্ন করিবার অবকাশ মিলিবে না। হারান ভালবাসার স্মৃতি নিয়াই তাহাকে আবার নূতন করিয়া ভালবাসার ঘর বাঁধিতে হইবে।

মাষ্টারমশাই একা একা অশ্বথ গাছটার নীচে বসিয়া রহিয়াছেন। অদূরে নূতন স্কুল বসিয়াছে। ছাত্র ছাত্রীদের এখান হইতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহাদের সকল কথাবার্ত্তা শোনা যায়। শিশুদের কথায় মাষ্টারমশাই শান্তি পান, তাই তিনি স্কুল বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই অশ্বথ গাছটার নীচে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকেন।

সীমন্তী ও সুমিত আসিয়া মাষ্টারমশাইয়ের পাশে বসিল।

মাষ্টারমশাই অবাক হইয়া বলিলেন, তোমাদের আজ সভা ছিলনা?

সীমন্তী বলিল, শ্রমিকদের সভা ছিলনা বলেই আজ আমাদের সভা হতে পারে নি।

মাষ্টারমশাই দুঃখিত হইয়া বলিলেন, কৃষকরা আসেনি?

সুমিত বলিল, ঠিক আপনার ছাত্র ছাত্রীর মতই। তিনটের সময় সভা আরম্ভ হ'বার কথা ছিল, ছটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলুম। মিশনারী প্রচারকদের সভার মতই কয়েকটি লোক সভা দেখবার জন্য ঘিরে দাঁড়িয়েছিল মাত্র!

মাষ্টারমশাই কোন কথা বলিলেন না, সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর সীমন্তী প্রশ্ন করিল, কাকাবাবু এবার আমরা কি করব?

মাষ্টারমশাই হাসিলেন, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

সীমন্তী বলিল, সত্যই আমরা বড় সমস্যায় পড়ে গেচি! আমরা যে মাত্রায় কার্য্যক্ষেত্র প্রসার করছিলুম, বহিঃশক্তি দ্বিগুণ মাত্রায় তা' সঙ্কুচিত করে দিচ্চে। কাজ নেই কাকাবাবু, আমরা কি কাজের অভাবে দেউলে হব?

মাষ্টারমশাই বলিলেন, কাজের অভাব কি? হাতের পাঁচ সভা সমিতি—

সীমন্তী বাধা দিয়া বলিল, ও ত' বেঁচে থাকবার অভিনয়।

মাষ্টারমশাই একটু ভাবিয়া বলিলেন, আমি সাধারণ মানুষ, রাজনীতিও বুঝিনা, সমাজনীতিও জানি না।

সুমিত হাসিয়া বলিল, আমি জানি আপনি সাধারণ নন। আপনি কংগ্রেসের সদস্য নন, কোন সভা সমিতিতেও যান না কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই কংগ্রেস চালিত হচ্চে। আপনার পরামর্শ যদি না পাওয়া যেত তবে এত দিনে কংগ্রেস ভেঙ্গে চুরে লুপ্ত হয়ে যেত।

মাষ্টারমশাই হাসিয়া বলিলেন, ও ভালবাসার কম্‌প্লিমেণ্ট।

সীমন্তী বলিল, আশ্চর্য্য এই চাষীজাত! এরা প্রথম নম্বরের বর্ব্বর অথচ এরাই দেবতার প্রকৃত সন্তান। সুমিতকে নিয়ে কয়েকটি গ্রাম ঘুরেচি। ভয়ে আমাদের ধারে আসতে সাহস পায় না। আশ্চর্য্য, এই সরল অশিক্ষিত জাতি আজ আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না।

মাষ্টারমশাই বলিলেন, মাটির টান বড় টান, কলের শ্রমিকদের মাটি নেই বলেই দুর্দ্ধর্ষ, নির্ভীক।

সুমিত বলিল, আচ্ছা, এদের ক্ষেপিয়ে দিলে কেমন হয়? এদের যদি

চরম বিপ্লবী করে তোলা যায় তবে কি এরা নিজের পথ নিজে কেড়ে নিতে পারবে না ?

মাষ্টারমশাই বলিলেন, অশিক্ষিত বর্ব্বরকে বিদ্রোহী করে স্থায়ী লাভ হয় না। আপন সত্ত্বার বিনাশ না হলে ওরা বাঁচবে কি করে ? বিপ্লবে লাভ আছে মানি কিন্তু ক্ষতিও আছে। ধনতন্ত্রবাদের মজ্জাগত নেশা এমনি যে, এই বিদ্রোহীরাই একদা ধনতন্ত্রবাদের রাজপথ গড়ে তুলবে। রোম ও স্পেনের এজন্যই পতন হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, গণতন্ত্র-বাদীরা এক নায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অপরের হাতে তুলে দেয়। তখন তাঁরা বুঝতে পারে না যে, শাসনক্ষমতার হস্তান্তর করেই পুনরায় এক নায়কত্বকে সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েচে। সে কথা যাক্, আমার মনে হয় বর্ত্তমানে চরম কোন প্রতিকার করা সঙ্গত হবে না। যাদের নিয়ে কাজ ওদের যদি হারাতে হয় তবে শক্তির অপব্যয়ই হবে। সুকৌশলে এদের মধ্যে এমনি ভাবে শক্তি স্ফুরিত করে দিতে হবে যাতে এরাই এদের পথ চিনে নিতে পারে, এরাই এদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিতে পারে। সীমন্তী, এদের শিক্ষিত করে তোল, মানুষ করে তোল।

সীমন্তী ছোট করিয়া বলিল, সে অবকাশ কি পাব ?

মাষ্টারমশাই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, কোন আশ্বাস দিলেন না। সুমিত অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, সীমন্তীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল না।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মাষ্টারমশাই উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, আমি আহ্নিকটা সেরে আসি। তোমরা কি বসবে ?

সীমন্তী মাথা ঝুঁকিয়া সম্মতি দিল।

মাষ্টারমশাই চলিয়া গেলেন।

সুমিত ও সীমন্তী নিঃশব্দে পাশাপাশি বসিয়া রহিল।

সুমিত হঠাৎ সীমন্তীর হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল, অবকাশ পাবে না মানে ?

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে ?

: আমি বোধ হয় চিরকাল বাচব ?

: না।

: তবে ?

: চিরকাল আমাকে এরা থাকতে দেবে কেন ?

: কোন খবর পেয়েচ কি ?

: না, তবে সন্দেহ করচি।

: তাই বল, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

: ভয়—কেন ?

: জানি না।

: আচ্ছা সুমিত, তুমি কখনও কাউকে ভালবেসেচ ?

: হ্যাঁ।

: সুলেখাকে, তোমাকে ও মাকে !

: সুমিত, দেশ বড় না ভালবাসা বড় ?

: দুর্ভাগ্য আমার, দেশকেও আজও ভাল করে চিনিনি, ভালবাসার মূল্য ও জানিনি। তুমি ভালবাসিয়েচ তাই ভালবাসি ; অদৃশ্য আকর্ষণে আত্ম-সমর্পণ করেচি কখনও যাচাই করিনি।

: তোমার নিকট দেশ বেশী প্রিয় না আমি বেশী প্রিয় সুমিত ?

: এর জবাব ত' আমি দিতে পারব না।

ঃ কেন—কেন ?

ঃ কোন দিন ভেবে দেখিনি !

ঃ আমার কথা কখনও ভাবনি ?

সুমিত সীমন্তীর দিকে একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাকে এত চঞ্চল, এত আত্মশক্তিহীন কেন দেখাচ্চে ?

সীমন্তী সুমিতের কোলে মাথা রাখিয়া বলিল, 'ওগো, আমি যাই হই না কেন, আমি মানুষ।

সুমিত সীমন্তীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, সীমন্তী, তোমার আজ কি হয়েচে ? কেন অমন করচ ?

ঃ আমি ভালবাসা চাই, প্রেম চাই ! আমি চাই পুরুষের বাহু বেষ্টন, পৌরুষের রুক্ষতা, পুরুষের অন্যায় প্রভুত্ব।

ঃ বলচ কি তুমি ?

ঃ সত্যি বলচি আমায় তুমি গ্রহণ কর, আমি আর পারি না।

ঃ সীমন্তী !

ঃ বল !

ঃ এর জন্তে কাল তুমি কত দুঃখ পাবে, কত অনুতপ্ত হবে তা জান ?

ঃ জানি, জানি আমি, সাধারণ নারীর মত প্রেম যাচ্ঞানা করে কাল আমার আত্মহত্যা করা ভিন্ন উপায় থাকবে না। সুমিত, আমি আর পারি না, আমায় তুমি গ্রহণ কর।

সুমিত সীমন্তীর হাত দুইটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল, তুমি ত' আমার সকল কথাই জান তবে কেন আমাকে এমনি করে অপমান করচ, নিজেও অপমানিত হচ্চ।

সীমন্তী সোজা হইয়া বসিয়া সুমিতের মুখের'পর মুখ আনিয়া আবেগে বলিল, সত্যি ?

সুমিত দুই হাতে সীমন্তীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আজ তোমার সন্দেহ করবার ত' কিছু নেই। প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সে দিনই ত' তুমি মরুভূমিতে মন্দাকিনী এনে দিয়েছ। তোমার আলোর আঘাতেই ত' নব প্রভাতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েচে।

সীমন্তী উল্লাসে বলিল, আমি !

সীমন্তী আনন্দে সুমিতের বুকে মাথা গুঁজিয়া জড়াইয়া ধরিল।

মাষ্টারমশাই নিঃশব্দে আসিতেছিলেন, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দেই চলিয়া গেলেন।

সুমিত অভিভূতের মত সীমন্তীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সে যেন একটি লোহার মানুষ জড়াইয়া ধরিয়াছে। মুহূর্ত্ত পরেই সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বংশ হইয়া যাইবে—ক্ষনিকের সুখ-স্বপ্নের রেশটাই শুধু স্মৃতি হইয়া থাকিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন সুমিত সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সীমন্তী চলিয়া যাইতেছে। সুমিত সংবাদ পাইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে, কিন্তু সীমন্তী কেন এবং কোথায় যাইতেছে তাহা এখনও জানে নাই। সুমিত সীমন্তীকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না। সীমন্তীর হাব-ভাবে তাহার কেমন একটু ভয় হইল, মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিতে সাহস পাইল না।

আশীষ ষ্টেশনে আসিয়াছে; আলতাফের জ্বর সেই জন্য সে আসিতে পারে নাই। মাষ্টারমশাইও ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

মিলের মজুরদের কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। সীমন্তীর যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিতে পারে বলিয়াই তাহাদের জানান হয় নাই।

আশীষ টিকিট কাটিতে গিয়াছে। মাষ্টারমশাই, সীমন্তী ও সুমিত একটি ইণ্টার ক্লাস কামরায় নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার এখনও দশ মিনিট সময় রহিয়াছে। মাষ্টারমশাই হয়ত সকল বিষয়ই জানেন সেই জন্যই ইচ্ছা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সীমন্তী জোর করিয়া উচ্ছ্বাস চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে, হয়ত অনেক কথাই তাহার বলিবার

ছিল কিন্তু কোন কথা বলিবার মত তাহার শক্তি নাই, শুধু ভাবান্তর এবং না বলিবার অক্ষমতা তাহাকে বিমর্ষ ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

সুমিত অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছে। কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না। গত এক রাত্রির মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে যাহার জন্য সীমন্তীকে এমনিভাবে পলাইয়া যাইতে হইতেছে। সুমিত বিমর্ষ হইয়া দুই জনের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ কোন কথাই বলিল না।

পীড়ন অত্যাচার? ইহা ত' নূতন নয়, অস্বাভাবিকও নয়! ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসবাদীদের এই অত্যাচার ও পীড়ন ত' কঠিন নয়। যাহারা কর্ত্তব্যের নির্ম্মম আদেশে জীবন-মৃত্যু লইয়া খেলা করিয়াছে, দুঃখ কষ্ট অনশন যাহাদের জীবনসঙ্গিনী ছিল, মৃত্যু, ভয় ও অতুলনীয় দুঃখ কষ্টকে জয় করিয়া যাহারা কত রাত্রিতে কত দুর্যোগ ঝড় তুফানে, কত গিরিবর্ত্ম, কত নদ নদী, কত প্রান্তর, কত ভয়াবহ দুর্গম স্থান কত দেশ বিদেশের অজ্ঞাত স্থান, কত অনাহারে ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছে, তাহাদের নিকট জমিদারের অথবা একটা দারোগার হুমকির মূল্য আর কতটুকু!

কারাবাসের ভয়? এমন কথাও যদি কেহ ভাবে তবে ইহারা হয়ত হাসি সংবরণ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বেচ্ছায় ফাঁসিকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিয়া মাতৃরূপ দর্শনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, স্বর্গীয় উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠে তাহাদের নিকট কারাবাস ত' অতি তুচ্ছ!

কলঙ্ক? সীমন্তীর কি কলঙ্কের ভয় আছে? কাল তাহার যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার জন্য কি সে লজ্জিত, অনুতপ্ত? সীমন্তী কি প্রায়শ্চিত্য করিবার জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে?

পাড়ায় পাড়ায় যে কুৎসিত কানাকানি চলিয়াছে, যে হীন গুজব নির্ম্মল ও পবিত্র প্রেমকে নারকীয় কুৎসিততার মধ্যে টানিয়া আনিতে চায় তাহাই কি সীমন্তীর জীবন দুর্ব্বিসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে? অকৃত্রিম ও পবিত্র প্রেম কি মিথ্যা দুর্নামের নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল? এত বড় দুর্ব্বলতার নিকট কি সীমন্তী কখনও মাথা নত করিতে পারে? সীমন্তীর এই দুর্ব্বলতাই যে মিথ্যা গুজবকে প্রাধান্য দিতে চলিয়াছে তাহা কি সীমন্তী বুঝিতে পারে নাই। মিথ্যা গুজব কি আন্তরিকতা সত্য ও সুন্দরের চেয়ে বড় হইয়া গেল? ··সীমন্তী কেন—কেন এত বড় ভুল করিতে চলিয়াছে? এই পর্ব্বত প্রমাণ ভুলের কি আর প্রতিকার হইতে পারিবে? সীমন্তী অকৃত্রিম কংগ্রেস সেবিকা, স্থানীয় কংগ্রেস সমিতির নেত্রী, তাই বলিয়া কি সে ভালবাসিতে পারিবে না—বিবাহ করিতে পারিবে না? কংগ্রেস নেত্রীর প্রেম কি অন্যায়, নিয়মতন্ত্র বিরুদ্ধ?

হঠাৎ সুমিতের মনে হইল, সীমন্তী শুধু নেত্রী নয়, সে কৃষক মজুর ও শ্রমিকদের জননী। এই অশিক্ষিত অসংস্কৃত জাতি দেশমাতাকে চিনে না, দেশমাতাকে বুঝেনা—তাহারা সীমন্তীকে দেশমাতারূপে জানে, চিনে এবং জনমাতারূপেই কামনা করে।

কিন্তু মানব-ধর্ম্ম প্রকৃতি? যে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম অদৃশ্য আকর্ষণে তাহাদের এমনিভাবে মিলিত করিয়াছে তাহাকে তাহারা অস্বীকার করিবে কোন যুক্তিতে? কংগ্রেস এমন কি নিয়ম করিয়াছে, এই শ্রমিকদল এমন কি বিধানের ইঙ্গিত করিয়াছে যাহার জন্য স্বাভাবিককে বর্জ্জন করিয়া ত্যাগের মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে?

ওয়ার্ণিং বেল পড়িয়া গেল। ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া সুমিত চমকিয়া উঠিল। আশীষ এখনও টিকিট কিনিয়া আসে নাই, হয়ত আসিয়াছিল চলিয়া গিয়াছে সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। মাষ্টারমশাই ও সীমন্তী অতি মৃদু স্বরে কথা কহিতেছেন।

সুমিত সীমন্তীর দিকে অগ্রসর হইয়া ধরা গলায় বলিল, সীমন্তী, তুমি কেন এমনি ভাবে চলে যাচ্চো ?

সীমন্তী কোন উত্তর দিল না, শুধু স্নিগ্ধ করুণ হাসিতে তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

সুমিত সীমন্তীর হাত ধরিয়া বলিল, আমি কি কোন অপরাধ করেছি ?

সীমন্তী মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, পাগল! তোমার অপরাধ কি শুধু তোমারই, আমার কি তা'তে অংশ নেই ?

—তবে।

সীমন্তী অনুরোধ করিয়া বলিল, পরে আপনিই সব জানবে, আমায় অনুরোধ করোনা—আমি দুর্ব্বল, আমার দুর্ব্বলতার উপর সুযোগ নিয়ো না সুমিত।

তোমার যখন আপত্তি তখন আমি কোন প্রশ্ন করব না। তুমি নিরুদ্দেশ যাত্রা করছ, আর এখানে আসবে কিনা জানি না। কোথায় থাকবে তা'ও হয়ত জানব না, কিন্তু আমাদের চলবে কি করে ?

সীমন্তী মাষ্টারমহাশয়ের দিকে চাহিল। উত্তর স্পষ্ট, সেই জন্যই সুমিত আর কোন প্রশ্ন করিল না।

সীমন্তী ঘড়িতে সময় দেখিয়া বলিল, আর মাত্র দু' মিনিট সময় আছে। আশীষ এখনও এলোনা। জানালায় মাথা গলাইয়া বলিল, সেরেছে! কাকাবাবু, আশীষ সদলবলে এদিকে আসছে। দেখছি তারা আমায় বিব্রত না করে ছাড়বে না।

মাষ্টারমশাই ও সুমিত কৌতূহলে প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিলেন।

সীমন্তী বলিল, কাকাবাবু সময় আর নেই, এবার আপনি নামুন, পরে ভীড়ের মধ্যে নামতে অসুবিধা হবে।

মাষ্টারমশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সীমন্তী পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলে মাষ্টারমশাই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সীমন্তী অপ্রত্যাশিতভাবে সুমিতকেও গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। সুমিত অবাক বিস্ময়ে শুধু সীমন্তীকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া চোখে চোখে চাহিয়া রহিল, কোন আশীর্ব্বাদ বা কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না।

এই বিহ্বলতার মাঝে একটা অব্যক্ত ব্যথায় সুমিতের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মনে হইল, সপ্তরাগে যখন বীণার ঝঙ্কার মূর্চ্ছনা গিয়াছে তখন অকস্মাৎ মূল তারটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সুমিতের প্রাণ একান্তভাবে বলিতে লাগিল, সীমন্তীকে কি শত অনুরোধে ধরিয়া রাখা যায় না? তাহার একটি মাত্র প্রার্থনা কি সীমন্তী রাখিবে না? হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার কি প্রয়োজন তাহার হইল!

আসন্ন বিরহে সুমিতের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু কোন অনুরোধ করিতে পারিল না। বলিতে না পারার ক্ষমতা তাহাকে ক্রমশঃ বিমর্ষ ক্লিষ্ট ও করুণ করিয়া তুলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার

চোখের উপর হইতে একমাত্র আশ্রয়স্থল পৃথিবীটা যেন পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল।

মাষ্টারমশাই সুমিত ও সীমন্তীর হাত দুইটি একত্র করিয়া দিয়া বলিলেন, যদি উপায় থাকত তবে আমি অনুরোধ করে, জোর করে হলেও মাকে ধরে রাখতুম, যেতে দিতুম না। মাষ্টারমশাই একটু থামিয়া যথাসম্ভব উচ্ছ্বাস দমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের ত্যাগের মধ্য দিয়ে তোমরা যে পবিত্র প্রেমের অমৃত রসে গরবিনী হয়েচ তা অক্ষয় হোক, চির উজ্জ্বল হয়ে থাক। তোমাদের অন্তরের মিলন তোমাদের দিক অক্ষয় শক্তি, দিক দুর্ব্বিনীত কর্ম্মশক্তি —তোমরা ত্যাগের মহিমায় জয়যুক্ত হও।

সীমন্তী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, কাকাবাবু, ত্যাগ—!

মাষ্টারমশাই সীমন্তীর আর্ত্তনাদ অজানিত-ভাবে এড়াইয়া গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া চোখ বুজিলেন। মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করিলেন কেহ জানিল না। হয়ত চিরবিচ্ছেদের মহিমায় ত্যাগীশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সীমন্তী পুনরায় মাষ্টারমহাশয়কে প্রণাম করিলেন, সীমন্তীর দেখাদেখি সুমিতও তাড়াতাড়ি নত হইয়া প্রণাম করিল।

দেখিতে দেখিতে একদল কুলিমজুর "বন্দেমাতরম" "জনমাতা কী জয়" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

মাষ্টারমশাই ও সুমিত তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। সীমন্তী কৃত্রিম হাসিতে মুখ ভরিয়া তুলিয়া জানালায় মাথা গলাইয়া বসিল। মাষ্টারমশাই নীচে আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইলেন। এতক্ষণ

তিনি সীমন্তীর মুখের প্রতি তেমন ভাবে লক্ষ্য করেন নাই। নীচে আসিয়া মুখোমুখী তাকাইতেই তাঁহার অন্তর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আসন্ন বিরহে যেন সীমন্তী দুর্ব্বল ও আশাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মাষ্টারমশাইয়ের মনে হইল, বিরহের সূচনায় সীমন্তী আর কংগ্রেস সেবিকা নয়, দুর্ব্বিনীত কর্ম্মী নয়, পর্ব্বতের মত অচল, অটল নয়—নারী মাত্র, রক্ত মাংসের মানুষ মাত্র।

.কুলি মজুররা যখন সীমন্তীকে না যাইবার জন্য বারবার একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিল তখন মাষ্টারমশাইও সীমন্তীকে থাকিয়া যাইবার জন্য একবার অনুরোধ করিলেন। কুলি মজুরদের একান্ত অনুরোধে সীমন্তীর মন গলিয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বলতা কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু মাষ্টারমশাই যখন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন সীমন্তী লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

সীমন্তী মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল, আমায় যেতেই হবে। আমায় আর অনুরোধ করে কষ্ট দিও না—বৃহত্তর কাজ আমায় আহ্বান করেচে।

কুলিসর্দ্দার বলিল, সন্তানের মা তুমি, আমাদের ত্যাগ করে তুমি কোথায় যাবে—আমাদের অজ্ঞান সন্তানের মানুষ করা ভিন্ন আর কোথায় তোমার বৃহত্তর কাজ আছে মা?

সীমন্তী শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, তোমাদের মঙ্গলের জন্য; দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আমাকে এ স্থান ত্যাগ করে যেতেই হবে।

কুলিরা বলিল, যে মঙ্গলের জন্য তোমাকে হারাতে হয়, সে মঙ্গল যত বড়ই হউক না কেন আমরা চাইনে।

সীমন্তী ম্লান হাসি হাসিল, কোন জবাব দিল না।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

কুলিসর্দ্দার অতি করুণ স্বরে প্রশ্ন করিল, চল্‌লে মা—কিন্তু আমাদের কার হাত দিয়ে গেলে মা ?

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সীমন্তীর চোখ হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সুমিতকে দেখাইয়া বলিল, ওঁর হাতে তোমাদের দিয়ে গেলুম বাবা। দুঃখ কি ? সময় হলে আবার আমি আসব।

কুলিদের জয়ধ্বনিতে গাড়ির চাকার শব্দ মিলাইয়া গেল।

আশীষ তাহার সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া দেশ উদ্ধার ও সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের মোক্ষম অস্ত্রগুলি সকলকে শুনাইতে শুনাইতে প্রবল বিক্রমে চলিয়া গিয়াছে।

মাষ্টারমশাই ও সুমিত এখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—কোথাও যাওযার স্থিরতা নাই বলিয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একা থাকিলে সুমিত হয়ত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়া নদীর পাড়ে বসিত।

মাষ্টারমশাই বলিলেন, দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে—চল।

সুমিত লজ্জিত হইয়া বলিল, চলুন। আমি আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলুম।

: আমার ওখানে যাবে, না—কোথায়ও কোন কাজ আছে।

: এখন কোন কাজ নাই। চলুন, আপনার বাড়িতে যাব।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া মাষ্টারমশাই বলিলেন, চল এক নবাগত

দম্পতির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে কিছু দিনের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছেন। সীমন্তীর বিশেষ বন্ধু।

: আজ যাক কাকাবাবু।

: কেন?

: I'm not in mood, হয়ত অভদ্র ব্যবহার করব, পরে এর জন্য লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

মাষ্টারমশাই হাসিলেন, কোন জবাব দিলেন না। সুমিতও আর কোন কথা বলিল না; নিঃশব্দে মাষ্টারমশাইকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

আকস্মিকভাবে মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, সুমিত, সীমন্তী চলে যাওয়াতে তুমি খুব অবাক হয়েছ নিশ্চয়।

: শুধু অবাক হইনি, অনেক ভেবে ভেবে কেমন যেন আমার মনের ধারা হয়েছে—যার ভাষা পাচ্ছিনে প্রকাশ করবার। আচ্ছা কাকাবাবু, কেন সে এমনি আকস্মিকভাবে চলে গেল বলতে পারেন? আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, আমাকে এ বিষয়ে কিছু না বলার কারণ কি? সীমন্তীর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, বিশেষ করে কাল রাতের পর থেকে যে মধুর সম্বন্ধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারপর অমনি না বলে নিরুদ্দেশ হবার কি কারণ থাকতে পারে? ওঁকে আমি বাধা দিতুম, না, ধরে রাখবার জন্য রাজ্যিশুদ্ধ লোকের সামনে কাঁদতে বসতুম।

: সেকথা ঠিক!

: তবে?

মাষ্টারমশাই সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, যখন তুমি সকল বিষয় জানবে তখন তোমার এ অভিমান থাকবে না।

ঃ যখন জানব! কখন আমার সে সৌভাগ্য হবে? দুঃখময় কৌতূহলের আনন্দে আমি যে তিলে তিলে সামুদ্রিক মৃত্যুতে মরে যাচ্ছি।

মাষ্টারমশাই কোন জবাব দিলেন না। সুমিতের প্রশ্ন এড়াইবার জন্য বলিলেন, চিত্রাদেবী ও বিজন বাবু এসেছেন সুমিত। ওই বাড়িতে ওঁরা অতিথি হয়েছেন। যাবে পরিচয় করতে?

চিত্রাদেবী ও বিজনের উপর সুমিতের বহুকাল যাবৎ কৌতূহল রহিয়াছে। নাম দুইটী শুনিবামাত্র সুমিত কৌতূহলে যেন শত শত টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভুলিয়া গেল ব্যক্তিগত বিরহ ব্যথা।

মাষ্টারমশাই বলিলেন, তোমার মন আজ ভাল নয়, ওদের সঙ্গে আলাপ করলে বেশ আনন্দ পাবে।

ঃ চলুন। ওদের 'পরে আমার নিজেরও কম কৌতূহল নেই। আপনি চিত্রাদেবী ও বিজন বাবুর কথাই তখন বলেছিলেন?

মাষ্টারমশাই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ। আমাদের ওল্ড কমরেড্।

ঃ ওদের ওপর এখনও কি নিষেধাজ্ঞা আছে?

ঃ সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। এতদিন ওরা বেনামে ছিলেন, এখন স্বনামে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। ওরা পলাতক হবার পর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

ঃ এতদিন দেখা হয়নি—ওদের খবর কি রাখতেন না?

ঃ খবর জানতুম কিন্তু কখনও দেখা করবার সুযোগ ঘটেনি। ওরা চীন, নেপাল প্রভৃতি স্থানেই বাস করেছেন, দু'বার মাত্র ভারতবর্ষে

এসেচেন। জেলেই বেশীকাল কাটিয়েচি—দেখা করবার সুযোগ হয়নি।

কথা কহিতে কহিতে সুমিত ও মাষ্টারমশাই একটি বাড়ির উঠানে আসিয়া পৌঁছিলেন। বারান্দায় একটি তরুণী ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাষ্টারমশাই ও সুমিতকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, কাকে চাই ?

মাষ্টারমশাই বলিলেন, চিত্রাদেবী ও বিজনবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

তরুণী চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল, বিজনবাবু খানিক পূর্ব্বে বার হয়ে গেচেন।

মাষ্টারমশাই বলিলেন, চিত্রাদেবীকে খবর দাও যে, কাকাবাবু এসেছেন।

তরুণী একটু অবাক হইয়া চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া গেল।

বসিবার ইঙ্গিত পাইয়া মাষ্টারমশাই ও সুমিত উপবেশন করিলেন। বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল না। একটুক্ষণের মধ্যেই চিত্রা 'কাকাবাবু কাকাবাবু' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল।

সম্মুখে আসিয়া চিত্রা থমকিয়া দাঁড়াইল। চিত্রা তাহার কাকাবাবুকে এমনিভাবে প্রত্যাশাই করে নাই। হতাশার বেদনায় চিত্রার মুখখানি করুণ ও মলিন হইয়া উঠিল। মাষ্টারমশাই মৃদু হাস্যে ডাকিলেন 'মা' ! চিত্রা মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া লইল এবং তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, কেমন আছেন ?

মাষ্টারমশাই সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, ভালই আছি মা !

চিত্রা অনুযোগের সুরে বলিল, আপনি বড় শুকিয়ে গিয়েছেন কাকু।

মাষ্টারমশাই হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো হ'য়েছি—।

চিত্রা বাধা দিয়া বলিল, আপনি ত' আর সাধারণ বাঙ্গালী নন যে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়বেন। আপনাকে যৌবনে, প্রৌঢ় অবস্থায় যারা দেখেছে তারা যদি এখন আপনাকে দেখে তবে শুধু অবাক হবে না, আঁৎকে উঠবে। তখন আপনার কী শরীর ছিল, আপনার মুষ্টির আঘাতে ইট পাথরও গুঁড়ো হয়ে যেত। কাকাবাবু, কি করে অমন হল ?

মাষ্টারমশাই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

চিত্রা অভিমানে বলিল, দুর্ভাগ্য সারা ভারতের যে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আপনাকে পেয়েও গ্রহণ করবার অধিকার পেলনা। চিত্রা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, জেলে আমিও গেচি, মাস তিনেক মাত্র ছিলুম—অভিজ্ঞতা সামান্য। কিন্তু আজ আপনাকে দেখে বুঝতে পারচি পরাধীন দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের কারাবাসের স্বরূপ। খুনী ডাকাতদের জেলে তৈরী করা হয় আর রাজনৈতিক বন্দীদের করা হয় ক্লীব।

মাষ্টারমশাই বলিলেন, প্রায় ত্রিশ বছর জেল খাটলুম, বছর পাঁচ ছয় বনে জঙ্গলে পুলিশের তাড়নায় শেয়াল কুকুরের মত পালিয়ে বেরিয়েচি—আর কত! এর পরও যে সারা রাজ্যি চলাফেরা করতে পারচি—অসীম ভাগ্য! জড় পঙ্গু হয়ে যে শয্যা আশ্রয় করিনি সেজন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাস মা!

চিত্রা হাসিয়া বলিল, সে জন্য করুণাময়ের নিকট সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতা

জানাব। আপনাকে যে এর পরেও কর্ম্মীরূপে পাওয়া গেচে তার জন্য অশেষ প্রণাম জানাই ভাগ্য-বিধাতার পায়ে। চিত্রা অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিল, আপনার সহকর্ম্মীর বংশ ত' প্রায় ধ্বংশ হয়ে গেচে। বিকাশবাবু জেলেই মারা গেলেন, প্রণব রায় আত্মহত্যা করেচেন, চন্দ্রশেখর বাবু পাগল হয়ে গেচেন, রাজেন্দ্র, চঞ্চল রায়, সতুদা, কুমুদ ও ব্রজেন্দ্র রাজ-যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন, সত্যেন ও বিনয়ের ফাঁশি হয়েচে—

মাষ্টারমশাই বাধা দিয়া বলিলেন, সে কথা আজ থাক মা, মনে হলে দুঃখই হয়। পরাজয়ের দুঃখ নয় চিত্রা, দুঃখ হয় স্বদেশ-বাসীর জন্য। ওদের জন্য যে সকল শত সহস্র দেশ প্রেমিক প্রাণ দিলে তাদের স্বদেশবাসী শত্রু বলে কলঙ্ক দিলে, বৈদেশিক শাসন ও সুশিক্ষার গুণে ঘৃণায় ও ভয়ে পাগল শৃগাল কুকুরের মত দূরে তাড়িয়ে দিলে কেউ তাদের অপূর্ব্ব ত্যাগ, অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ও নির্য্যাতন বরণের মূল্যইত দিলেনা, বরঞ্চ অপমান, নির্য্যাতন ও কলঙ্কের বোঝা বাড়িয়ে দিলে। স্বদেশবাসীর জন্য আমি আমাদের শাসকদের নিকটই লজ্জায় অপমানে মরে যাই।

মাষ্টারমশাই একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন, সন্ত্রাসবাদকে আমি শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করিনা, ওর প্রতি এখন আর আমার কোন আস্থাও নেই, কিন্তু ওর যতটুকু মূল্য ছিল তা কখনও ব্যর্থ হয়নি। এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকলে অন্যান্য দেশের মত সন্ত্রাসবাদই ভারত-বর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দিতে পারত। নতুন জীবন দান করতে পারত। চিত্রা, দেশের যদি স্বাধীনতা চাও, নিরন্ন লোকের মুখে

যদি দিতে চাও অন্ন, কোটি কোটি লোকের যদি দুঃখ মুছাতে চাও তবে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের প্রত্যেককেই চরম বিপ্লবী করে তোল। শিক্ষা দাও, দীক্ষা দাও, আপনাকে চিনিয়ে দাও, শোষণের দাহ জ্বালিয়ে দাও, দেখবে এ দেশ চরম বিপ্লবীতে ভরে গেচে। চিত্রা, তোমরা দেশের জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষা দাও। শতকরা ৮০ জন শিক্ষিত হিন্দুই দেশের স্বাধীনতার জন্য অল্পবিস্তর ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ২৩কোটী হিন্দুকে যদি শিক্ষিত করতে পার তবে দেশের স্বাধীনতা আপনি এসে ধরা দেবে। মুসলমান সমাজ যদি শিক্ষিত হয়ে ওঠে তবে কি মনে কর গোঁড়ামি ও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে দু'এক দিনের বেশী পৃথক হয়ে থাকবে? থাকবে না চিত্রা, ওরাও দলে দলে যোগদান করবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। ওরা শিক্ষিত হলেই ওরা কোন স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী, জাতীয়তার শত্রুর ক্রীড়ক থাকবে না, আপন স্বত্বা ওদের নব-জীবন দান করবে। দু'সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তি, বুদ্ধি, প্রচেষ্টার গুণে কংগ্রেসের রূপ বদলে যাবে। যে ধর্ম্ম বর্ত্তমানে প্রধান ও দুর্জ্জয় প্রতিবন্ধক হয়ে আছে তা' যাবে অন্তঃপুরে, ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার বস্তু হয়ে ঘরের মধ্যেই এবং হৃদয়ের রুদ্ধ অন্তরীক্ষেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

সুমিত ও চিত্রা নিশ্চল হইয়া শুনিতে লাগিল, মাষ্টারমশাই বলিতে লাগিলেন, শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে যে সকল স্বদেশবাসী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের দাবিয়ে রেখেচে ওদের মত দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু আর নাই জানি, কিন্তু তাই বলে ওদের অন্তরকে অস্বীকার করে চাকুরীর মুখোসকেই প্রধান বলে ধর না।

কংসনদীর তীরে

মাষ্টারমশাই একা একা অনেকক্ষণ কথা কহিয়া একটু শ্রান্তি বোধ করিলেন। চিত্রা হাত-পাখাটা নিয়া মৃদু মৃদু হাওয়া করিতে করিতে সুমিতকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, কাকু, ওঁর সঙ্গে ত' পরিচয় করে দিলেন না।

মাষ্টারমশাই একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, অহো, ভুল হয়ে গেছে মা! ইনি সীমন্তীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্ম্মী। জমিদার ও ব্যবসায়ী রাজনারায়ণ বসুর নাম শুনেচত'—ওঁরই পুত্র। আর—

চিত্রা মৃদু হাস্যে নমস্কার করিল। সুমিত প্রতি নমস্কার করিয়া মাষ্টারমশাইকে বাধা দিয়া বলিল, আমি ওঁর পরিচয় জানি তবে উনি বর্ত্তমানে কোথায় আছেন তা জানি না। ওঁদের প্রতি আমার কৌতূহলের সীমা নেই কিন্তু সীমন্তী এত চাপা মানুষ যে একটি কথাও বের করতে পারিনি।

চিত্রা হাসিয়া বলিল, কৌতূহলে থাকা ভাল—ভবিষ্যতে জুলুম করবার সুযোগ মিলবে। একজন আগন্তুককে দেখিয়া চিত্রা বলিল, কাকাবাবু ঐ যে উনি এসে গেচেন।

একজন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের সুদর্শন যুবক প্রবেশ করিল।

মাষ্টারমশাই উৎসাহভরে বলিলেন, এই যে বাপুজী, এস। তোমার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলুম।

বিজন মাষ্টারমশাইকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, ভাল আছেন ত?

মাষ্টারমশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, রাজনৈতিক শ্রমিক আমরা, না ভাল থেকে উপায় আছে আমাদের। তারপর কোথায় বের হয়েছিলে?

বিজন বলিল, কৃত্রিম সহরটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে এলুম। সুমিতকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, ওঁকে ত' চিনতে পারলুম না।

চিত্রা বলিল, গঙ্গাজল যাঁর প্রসঙ্গে মহাকাব্য লিখে জানিয়েছিল না—ইনি সেই ভাগ্যবান শ্রীসুমিতকুমার বসু।

বিজন নমস্কার করিয়া বলিল, আপনিই সুমিত বাবু!

সুমিত বলিল, সীমন্তী অত কি লিখেছেন জানি না, তবে উনি দুর্ব্বলতা বশতঃ হয়ত অনেক সুখ্যাতি করে লিখেচেন—স্নেহ ও প্রীতির বিচারে সব সত্য খাঁটি সত্য নয়। সত্য সত্যই আমি অতি সাধারণ মানুষ—আজ দুর্ব্বলতা ও সংস্কার পর্য্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

মাষ্টারমশাই কথার প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া দিবার জন্য অথবা নিজের কৌতূহল বশতঃ প্রশ্ন করিলেন, চিত্রা, তোমাদের আদর্শ ও নীতির বিরোধ মিটেছে?

চিত্রা হাসিয়া বলিল, না। আদর্শ ও নীতি নিয়ে আমাদের প্রায়ই ঝগড়া হয়।

মাষ্টারমশাই বলিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে এত মত বিরোধ থাকা ত' ভাল নয় মা!

চিত্রা অভিমান করিয়া বলিল, আমার কি দোষ কাকু! ওঁর যত উদ্ভট চিন্তা আর একগুঁয়েমি। আমি আর পারি না। কত বোঝাই, লোকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিদ্রূপ করে, তবু উনি হার মানেন না। ভীষণ একগুঁয়ে মানুষ।

বিজন কোন উত্তর করিল না, বরঞ্চ কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

চিত্রা রাগিয়া বলিল, আবার হাসছ। ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা করতে চাও, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব নিয়ে কি করে যে তর্ক কর আমি ভেবে পাইনে। তোমার ওপর কংগ্রেসের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা সঙ্গত বলে মনে করি। আমার দোহাই দিয়ে তুমি আর নিষ্কৃতি পাবে না!

বিজন তথাপি চটিল না, এমন কি কোন উত্তর দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনও করিল না।

সুমিত একটু অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আপনারা আদর্শ ও নীতির বিরোধ নিয়ে কি করে সংসার করেন?

চিত্রা বলিল, ভালবাসার মূল উৎস যদি পবিত্র থাকে তবে বাহ্যিক কোন বিরোধই তার এক তিল ক্ষতি করতে পারে না। দেশ-প্রেম যেখানে খাঁটি এবং সত্য, সেখানে কারো কর্ম্মনীতি যদি ভুল হয় কিম্বা বাহ্যত প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রতীতি হয় তবে দেশ-প্রেমটা শুকিয়ে যায় না সুমিত বাবু!

সুমিত বুঝিতে পারিল না, প্রশ্ন করিল re-action ত' আছে। যেখানে আদর্শ ও নীতির fundamental বিরোধ সেখানে গার্হস্থ্য জীবনে প্রভাব না পড়ে যায় না।

চিত্রা বলিল, যতদিন পর্য্যন্ত প্রেম অকৃত্রিম থাকবে এবং দৈহিক মিলটাই প্রধান ও একমাত্র সম্বন্ধ হয়ে না উঠবে ততদিন পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য জীবনে ওর প্রভাব বিস্তার হবে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা যে একটা ধর্ম্ম তা ভুলে যাচ্চেন কেন? ধর্ম্মের সঙ্গে যেমন রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই, তেমনি প্রেম-ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতিরও কোন যোগ নেই।

এ কথাটা আমার সর্ব্বদা মনে রাখবেন সুমিত বাবু, যে, নিষ্ঠা পবিত্রতা ও আন্তরিকতা যদি থাকে তবে আদর্শ বা নীতিগত যত বড় বিরোধই থাকুক না কেন কখনও প্রেমে মিলন হয় না—স্বদেশ সেবার কর্ত্তব্য হতেও এক তিল বিচ্যুতি হয় না।

সুমিত আর কোন উত্তর করিল না। চিত্রা খানিক নীরব থাকিয়া হাসিয়া বলিল, এই দেখুন না, উনি আমাকে না নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছিলেন। আমিও জানি, উনিও ভাল করেই জানেন যে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবেন না। তবু জোর করে একা একা বেড়াতে বার হয়ে গেলেন কিন্তু পারলেন কি থাকতে—ফিরে আসতে হ'ল। অথচ আমাদের তরুণ-তরুণীর কাঁচা প্রেম নয়—বহু পুরাতন। আমার চেহারা ত' দেখচেন, রূপের জৌলুস ত' দূরের কথা যৌবন ও রূপের এমন কোন আকর্ষণ নেই যার জন্যে একটি পুরুষকে এমনি করে স্ত্রৈণ করা চলে। বর্ত্তমান যুগের অতি আধুনিকগণ ওঁর স্ত্রৈণ স্বভাব দেখলে হেসেই খুন হবে।

সুমিত বলিল, আপনারা অদ্ভুৎ, অসাধারণ, য়্যাক্সিডেণ্ট কথাটা ব্যবহার করলে উপযুক্ত হবে বলে আমার ধারণা।

একটি চাকর চায়ের সরঞ্জাম দিয়া গেল। চিত্রা চা তৈয়ার করিতে করিতে প্রশ্ন করিল, কাকাবাবু, ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতা করে ওদের নতুন জাতিতে পরিণত হওয়া কি দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

মাষ্টারমশাই একটু ভাবিয়া বলিলেন, না।

চিত্রা সগর্ব্বে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সন্দেহ মিটেছে ত' ?

বিজন বলিল, যে বিশ্বাস একটি মাত্র না কথায় মুছে যায় তা বিশ্বাস নয়—অজ্ঞতা।

স্মিত প্রশ্ন করিল, বিজনবাবু, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে আপনার প্রস্তাবটা শুনতে পারি কি ?

বিজন বলিল, দেখুন আমার বিশ্বাস এবং নীতিতে স্বদেশ প্রেমের মুখরোচক কথা নেই, চোখ ঝল্সান আড়ম্বর নেই, রক্ত চঞ্চল করে দিতে পারে এমন বাক্য-বিন্যাসও করবার ক্ষমতাও আমার নেই। বরঞ্চ দেশদ্রোহী প্রতিক্রিয়াশীল অনেক কিছু বিশেষণ আখ্যা দেওয়া যায়—প্রতিবাদ করবার উপায় নেই।

স্মিত সহাস্যে বলিল, সেত' সাধারণের জন্যে একচেটিয়া হয়ে আছে, আমাদের হস্তক্ষেপ বে-আইনী !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চটকলের শ্রমিকগণ তাহাদের দাবী জানাইয়া যে চরমপত্র দিয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা উপেক্ষা করায় শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কলের শ্রমিকগণ কোন দাবী জানায় নাই, কিন্তু চটকলের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে।

ধীরে ধীরে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিলে ধর্ম্মঘট বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু কয়েকজনের গ্রেপ্তারের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করিল।

শ্রমিকগণ যাহাতে উত্তেজিত অবস্থায় বিশ্বস্ত শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের নির্য্যাতন ও প্রহার না করিতে পারে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া মিলের যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র নষ্ট করিতে না পারে এই অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশ আমদানী করিয়াছেন। মিলকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে তিন মাইলের মধ্যে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আশীষ, আলতাফ, বিপিন রায়, মুর্সেদ মিঞা নিরঞ্জন রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা ও অন্যান্য অভিযোগে ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়। মাষ্টারমশাই নজরবন্দী হইয়াছেন এবং চিত্রাদেবী ও বিজন বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

এ উত্তেজনার বন্যায় কৃষকগণও নিষ্কৃতি পায় নাই। তাহারাও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু ধরপাকড়ের হিড়িক, পুলিশের লাঠি এবং সশস্ত্র সৈন্যদের বন্দুক ও সঙ্গীনের দাপটে নিরীহ শ্রমিকগণ ভয়ে আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়ায়।

শ্রমিকগণ সঞ্চয় করিতে জানে না এবং সঞ্চয় করিবার মত উপার্জ্জন করিতেও পারে না। কাজেই বহুদিন যাবৎ মজুরী না পাওয়ায় তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। যে সকল শ্রমিক নেতা ও কর্ম্মী অর্থ সাহায্য করিতেন তাহারা জেলে কিংবা হাজতে আটক থাকায় ধর্ম্মঘটিগণ সম্পূর্ণরূপে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।

একমাত্র ভরসা ছিল সুমিতের উপর, কিন্তু এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সুমিতের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহার হাতে যে টাকা-কড়ি ছিল তাহা সে বহু পূর্ব্বেই বিলাইয়া দিয়াছে। জমিদারী হইতে সে যে মাসহারা পাইত তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং রাজনারায়ণ বাবুর কড়া হুকুমে জমিদারী হইতে একটি পয়সা পাইবার কোন সুযোগ নাই। সুমিত যাহাতে অন্য কোন উপায়ে টাকা না পাইতে পারে সেজন্য রাজনারায়ণ বাবু সকলকে ঋণ না দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

জমিদার এবং মিলের মালিকদের ভয়ে কিংবা হুকুমে কোন লোক শ্রমিকদের কোনরূপ সাহায্য করে না, এমন কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত বুভুক্ষিতদের ধার দিতে রাজি হয় না। বর্ত্তমানে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, শ্রমিকরা প্রত্যহ খাইতে পায় না।

সুমিত শ্রমিকদের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না। তবু সে প্রত্যহ দুইবার বস্তিতে আসে। সুমিত শ্রমিকদের ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাইয়া কোন প্রবোধ বাক্যও বলিতে পারে না। লজ্জায়, দুঃখে ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা আজ খাইতে পারিতেছে না, যাহাদের শিশু পুত্র কন্যা একটুকরা রুটির জন্য হাহাকারে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মুখে আধটুকরা রুটি না তুলিয়া কোন কথা বলিবে!

ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা এত সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িল না। অদ্ভুৎ তাহাদের সাহস; অদ্ভুৎ তাহাদের সহনশীলতা, দুর্জ্জয় তাহাদের সংগ্রাম শক্তি। সুমিতের বিস্ময় লাগে। ভাবে, এই অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন বঞ্চিত বুভুক্ষুর দল কিসের প্রভাবে এত দুর্ব্বিনীত হয়, এত দুদ্দমনীয় হয়? এরা কোন মন্ত্রে কোন শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এমন প্রলয়ঙ্কর বীর হইয়া উঠে? ঘরে নাই খাবার, পরণে নাই বস্ত্র, অনাহারের পীড়নে পুত্র কন্যা তুলিয়াছে হাহাকার—অথচ একটু শঙ্কা নাই, একটু চাঞ্চল্য নাই, সুদূরপরাহত জয়ের জন্য মৃত্যুপণ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

সুমিতের মনে সংশয় জাগে, একটু ক্লিষ্ট স্বরে প্রশ্ন করে, ফুল, একি একটা নেশা? কি শুধু মোহ, শুধু সাময়িক উত্তেজনা—এর মধ্যে কি আন্তরিকতা নেই, কোন intelect নেই।

ফুলকোয়ারা একটু ভাবিয়া জবাব দেয়, হয়ত নেই। মস্তিষ্ক যেখানে প্রধান সেখানে মনুষ আত্মভোলা হ'তে পারে না।

: আমরা কি আত্মভোলা হয়ে দেশকে ভালবাসি না?

: না। আমার ত' মনে হয় বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভালবাসা যায় না।

বিচার বুদ্ধি দিয়ে সেবা করা যায়, কাজ করা যায় কিন্তু ভালবাসা যায় না।

: বিজ্ঞাপনের গবেষণা নিয়ে কি মানুষ আত্মভোলা হয় না—সেখানেও intelectই একমাত্র সম্বল।

: লেখাপড়া কিংবা বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণা ভিন্ন কথা। আমি পণ্ডিত নই, কোন দিন কোন গবেষণা অথবা কোন পরীক্ষা করিনি। তবে এটুকু আমার মনে হয় ওটাও একটা নেশা। নেশায় নেশায় তারতম্য থাকে কিন্তু গতিটা এক। সেদিন আপনিই ত' বলে ছিলেন ধর্ম্মও একটা নেশা। মদ, গাঁজার নেশা আর ধর্ম্মের নেশা কি এক ?

কয়েকদিন পূর্ব্বে ধর্ম্ম লইয়া ফুলকোয়ারার সঙ্গে স্নমিতের ভীষণ তর্ক হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় সেদিনের কথা উঠিয়া পড়ায়, স্নমিত সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, ধর্ম্মটা যে একটা নেশা তা' তুমি স্বীকার করচ তবে।

ফুলকোয়ারা হাসিয়া জবাব দিল, আবার সে বিতর্ক টেনে আনছেন ত'! আপনি বৈজ্ঞানিক মানুষ, আপনি যত সহজে ধর্ম্মকে ছুড়ে ফেলতে পারেন আমি দু'খানা বিজ্ঞাপনের বই পড়ে কিংবা আপনার বক্তৃতা শুনে কি করে এত সহজে ধর্ম্মকে উড়িয়ে দিই বলুন।

স্নমিত সেদিন বলিয়াছিল, ধর্ম্ম সব চেয়ে বড় নেশা! সাধারণ মানুষ যাতে ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে এবং বঞ্চিতের দল যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা অধিকার করবার জন্য বনিকসম্প্রদায়কে সমতলে টেনে না আনতে পারে সেজন্য ধনতন্ত্রবাদীরা বহু অর্থ ব্যয় করে মন্দির মসজিদ ও গির্জ্জা প্রভৃতি নির্ম্মান করে দেয়। এই মারাত্মক নেশায় সাধারণ লোক এত মাতাল থাকে যে ষড়যন্ত্রটা ধরতে পারে না। ধর্ম্মের যদি

এত মারাত্মক নেশা না থাকত তবে মানুষে মানুষে এত বড় পার্থক্য থাকত না এবং যে পৃথিবীতে অগনিত লোক সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আপ্রাণ খেটে পেট ভরে খেতে পায়না, সে পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় লোক বিনা পরিশ্রমে ঐশ্বর্য্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারত না। এ নীতিটা আজকের নয়, আদি যুগ হতে চলে এসেচে। এ চরম ও মারাত্মক নীতি অনুসরণ করেই ধনী সম্প্রদায় কল কারখানা, খনির চারপাশে নেশার নন্দনকানন খুলে দেয় এবং শ্রমিকদের লেখাপড়া শিখবার সুযোগ দেয় না।

ফুলকোয়ারা সেদিন উত্তর দিতে পারে নাই, আজ জবাব স্বরূপ বলিল, আপনি পণ্ডিত মানুষ, তর্ক করে আপনার সঙ্গে আমি পারব না। ধনতন্ত্রবাদীরা হয়ত ধর্ম্ম বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করচে কিন্তু তা' বলে ধর্ম্মটা বদ নেশা নয়। যান্ত্রিক সভ্যতার যতই বড়াই করুন না কেন ও শুধু নেশা নয়, মাতলামী। ধর্ম্মের নেশায় মানুষ শান্তি পেতে পারে, স্বস্তিতে বাস করতে পারে, বিশ্বমানবতার গৌরবে মহান হতে পারে কিন্তু যান্ত্রিক যুগের ইউরোপীয় সভ্যতায় মানুষ স্বস্তিতে ও শান্তিতে বাস করতে পারে না, এ মারাত্মক নেশার উৎকট মাতলামীতে নিজেও মরে. অপরকেও ধ্বংশ করে। অন্তঃসার-শূন্য, অগভীর ও হালকা জীবনে কখনও বড় হওয়া যায় না। ওদেশের সকল মনীষীর, সকল বড়লোকের জীবন আমি জানিনে কিন্তু যে অল্প কয়েক জনের জেনেচি তাদের জীবনধারা, তাদের চিন্তাধারা আধুনিক য়ুরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতায় পড়ে না।

সুমিত বলিল, যান্ত্রিক সভ্যতাকে আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি,

এমন ধারণা করে তুমি আমার ভুল বিচার করেচ। বিদ্যুৎ চমকায়, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমরা বিস্মিত হই কিন্তু চাঁদ বা সূর্য্যের আলোকে আমরা বিস্মিত হই না।

: বুঝতে পারলুম না।

: আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, যত ক্ষণস্থায়ীই হোক, বিদ্যুতের আলোক অনেক বেশী তীব্র এবং অনেক বেশী চকচকে। য়ুরোপীয় সভ্যতা যা' খুশী হোক—ওরা আধুনিক সভ্যতায় শক্তিমান হয়ে আমাদের দেশ জয় করেনি যে, আমাদের সে সভ্যতা লাভ করে দেশোদ্ধার করতে হবে। ধর্ম্ম যে মানুষকে শান্তি দিতে পারে তা' চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম্ম যেখানে পোষাক নয়, পরদেশ গ্রাসের অস্ত্র নয়, ধর্ম্ম যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের কৌশল নয়, সেখানে সরল সাধারণ মানুষ শান্তি পেতে পায়। কিন্তু যে যুগে মানুষ অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসে ডুবে থাকে; আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েও বিদ্রোহ করে না, চরম দারিদ্র্যে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেও অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করে—সে ধর্ম্ম বিশ্বাসের আমি প্রশংসা করতে পারিনে। সুমিত একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, আমি ধর্ম্মের গোড়ামি ভেঙ্গে দিতে চাই। যেদিন গোড়ামি ভেঙ্গে দেব, ধর্ম্মের নেশা হ'তে মানুষের মনকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারব, সেদিন সর্ব্বসাধারণ মানব আত্মশক্তিমান হবে অপরের পাশে নিজেকে চিনে। সেদিন মানব বলবে আমি চাই শিক্ষা দীক্ষা, আমি চাই সুখে শান্তিতে বাস করতে—ওতে আমারও জন্মগত অধিকার আছে। মানব তখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেবে না, নারীর মত ভগবানের নিকট অশ্রু বিসর্জ্জন

করে দুঃখ জানিয়ে সুখ সম্পদ ভিক্ষা চাইবে না; তখন সে তার জন্মগত অধিকার দাবী করবে। আত্মশক্তিমান মানব যখন দাবী করতে গিয়ে পাবে রূঢ় আঘাত তখন হবে মহা বিপ্লব। তখন তাদের দমন করতে পারে, বঞ্চিত করে রাখতে পারে এমন শক্তি কারও নেই— রাজারও নয় ধনতন্ত্রবাদীদেরও নয়। এ কথা মনে রেখো ফুল, যে দেশ, যে জাতি জনসাধারণের প্রাণে আগুন জ্বালাতে পারবে সে দেশ কিংবা সে জাতি হবে সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

ফুলকোয়ারা কোন কথা বলিতে পারিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সুমিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুমিত বলিল, আমি এবার উঠি, বস্তিতে যেতে হবে। ওদের সাহায্য করবার সামর্থ নেই, ওদের পাশে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারিনে, ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

ফুলকোয়ারা বলিল, তবু আপনাকে যেতে হবে, ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও ওরা শান্তি পাবে, সাহস পাবে। বোম্বে থেকে হয়ত দু'চার দিনের মধ্যে টাকা আসতে পারে।

ঃ বোম্বে, আমেদাবাদে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করেচে। বোম্বের শ্রমিক সঙ্ঘ যে এ অবস্থায় টাকা পাঠাতে পারবে তা' আমার মনে হয় না। কলকাতা থেকে এখন আর সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর নয়।

ফুলকোয়ারা একটু ভাবিয়া বলিল, আমার ত' আর কিছু নেই। বাবা আগে আমার নিকট সংসারের খরচ দিতেন, আমি নিজের

খুশী মত খরচ করতে পারতুম। এখন উনি আমায় একটি পয়সাও দেন না। শেষ সম্বল এ চুড়ি দু'গাছি আছে—এই নিয়ে যান।

: ও অনুরোধ ক'রনা। একে একে সবই ত' নিলুম, হাত দুটি আর খালি করতে পারব না।

: তা'তে দুঃখের কি আছে—লজ্জারও ত' কিছু নেই। যেখানে শত শত লোক না খেয়ে মরতে বসেচে—

: শুধু মরতে বসেনি, ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের ক্রন্দন, হাহাকার যে কি মর্ম্মন্তুদ—আমি সহ্য করতে পারি না ফুল। উপায় নেই ফুল—সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার কাছে তোমার এ দু'গাছি চুড়ি বিদ্রূপ মাত্র হবে।

ফুলকোয়ারা চুড়ি দু'গাছি খুলিয়া দিয়া বলিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দু'তিন দিন ত' খেতে পারবে। আমি বিধবা মানুষ, খালি হাতে আমার লজ্জা নেই। দু'টি লোকও যদি উপকৃত হয় তবেই আমার গৌরব।

সুমিত মুগ্ধ হইয়া অভিভূতের মতই ফুলকোয়ারার হাত দুইটি টানিয়া লইল। ফুলকোয়ারার অন্তরটা একটু কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ করিতে পারিল না।

সুমিত হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। চুড়িগুলি পকেটে পূরিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল।

ফুলকোয়ারা জানালায় হেলান দিয়া যে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। আকাশে ঘন কাল মেঘ। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেমন একটা ভাপসা গরম। উন্মুক্ত জানালা দিয়া জমাট

আঁধার শত শত ফণা বিস্তার করিয়া ফুলকোয়ারার মনকে গ্রাস করিল।

ধীরে ধীরে মিল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগিল। শ্রমিকরা অর্দ্ধানশন ও অনশন করিয়া থাকিতে পারিল না—গাছের মূল, লতা পাতা ও শাক সবজি খাইতে আরম্ভ করিল। অখাদ্য ও কুখাদ্য খাওয়ার ফলে বস্তিতে কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসার অভাবে রোগগুলি সংক্রামক ও মহামারির আকার ধারণ করিল। সংক্রামক রোগগুলি বস্তি হইতে বস্তির পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। প্রত্যহ এত বেশী লোক রোগে আক্রান্ত ও মারা যাইতে লাগিল যে, চারিদিকে বিভীষিকার সৃষ্টি হইল।

দেখিতে দেখিতে কয়েক দিনের মধ্যেই মহামারি মারাত্মক হইয়া পড়িল। যাহাদের অন্যত্র যাইবার সুযোগ ও সুবিধা আছে তাহারা অন্যত্র পলাইয়া যাইতে লাগিল। সকল যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হইয়া গেল।

আপোষ মীমাংসার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া কোন সম্মান এবং সন্তোষজনক সর্ত্ত করিতে স্বীকৃত হন নাই; ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহের অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মড়ক ও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় শ্রমিকগণ অহিংস নীতি ভুলিয়া গেল এবং লুটপাট করিয়া প্রতিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

সুমিত শ্রমিকদের লইয়া মহা বিপদে পড়িয়া গেল। সে অনেক

চেষ্টা করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিজের আংটি, ঘড়ি কলম ও বোতাম বন্ধক দিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে, ফুলকোয়ারাও তাহার শেষ সম্বল মৃত্যুমুখী শ্রমিকদের রক্ষার্থে সুমিতের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সুমিত সুলেখাকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবিয়াছে কিন্তু কিছুতেই রাজি করাইতে পারে নাই। সুলেখা পাষাণীর মত শ্রমিকদের কাতরাশ্রু উপেক্ষা করিয়াছে—জীবন-মৃত্যু সমস্যায়ও তাহাদের বিদ্রোহকে মার্জ্জনা করিতে পারিল না।

মিলে লুটপাট করিবার জন্য যখন শ্রমিকগণ শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল তখন সুমিত আর স্থির থাকিতে পারিল না। মাতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বহুমূল্যের গলার হারটি অতি সন্তর্পণে সিন্দুক হইতে অপহরণ করিয়া লইল।

গলার হারটি বাহির করিয়া লইতে সুমিতের হাত কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে পড়িল এই হারটি তাহাব মাতা মৃত্যুকালে শেষ দান করিয়া গিয়াছিলেন। নিজের হাতে হারটি তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছিলেন "বৌমাকে" দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়ত হবে না। এই হারটি তোর ঠাকুরমা আমার গলে পরিয়ে বধূবরণ করেছিলেন। এটি আমি তোর গলায় পরিয়ে যাচ্ছি বৌমাকে তুই নিজের হাতে পরিয়ে বলিস যে, 'মা'র আশীর্ব্বাদ'।... তাহার মা বাঁচিয়া নাই, শেষ সাধ তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সুমিতের মনে হইল, এই হার বিক্রয় কিংবা বন্ধক দিবার ত' তাহার কোন অধিকার নাই। বধূমাতা হইয়া যিনি এ সংসারে প্রবেশ

করিবেন—এ হার তাহারই। মাতার শেষ অনুরোধ—শেষ বাসনা কি সে রক্ষা করিবে না—অপরের আশীর্ব্বাদপূর্ণ উপহারটি কি সে চুরি করিবে? মাতার কথা মনে পড়ায় সুমিতের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রুধারা নামিল। আজ তাহার মা জীবিত থাকিলে এই অবস্থা দাঁড়াইত না—তিনি যে ভাবেই হউক একটা প্রতিকার করিতেন। শ্রমিকদের ও প্রজাদের রক্ষার জন্য তাহাকে মাতার স্মৃতিচিহ্ন বিক্রয় করিতে হইত না—তিনি নিজের সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া এই সর্ব্বহারাদের রক্ষা করিতেন।

সুমিত হারটি হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। স্মৃতি-চিহ্ন বিক্রয় করিবার সাহস সে কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিল না—সংস্কারমুক্ত হইতে পারিল না।

সুমিতকে একা একা এমনি ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সুলেখা কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সুমিত সুলেখার উপস্থিতি বুঝিতে পারিল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। চোখের কোণ সিক্ত, দৃষ্টি উদাস।

সুলেখা বিস্মিত ভাবে ডাকিল, দাদা।

সুমিত চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি হারটি পকেটে পূরিয়া ফেলিল এবং সহজ হইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, আমায় ডাকচিস সু?

সুলেখা বলিল, তোমার পকেটে ওটা কি দাদা?

: হার।

: হার! কার হার?

: মা'র!

: মা'র হার দিয়ে কি হবে ?

সুমিত কোন উত্তর করিল না।

সুলেখা বলিল, কি হয়েচে দাদা! বল, তোমাকে আজ এত উত্তেজিত দেখাচ্চে কেন ?

সুমিত একটু ভাবিয়া বলিল, মা'র শেষ উপহারটি আমাকে বিক্রী করতে হচ্চে।

: বিক্রী করবে! সুলেখা চমকিয়া উঠিল।

: আশ্চর্য্য হচ্চিস সু! আমিও কম আশ্চর্য্য ও কম দুঃখিত হচ্চি না। কিন্তু এ ভিন্ন আর কোন উপায় খুঁজে পাচ্চিনি। আমার অহঙ্কার, আমার আভিজাত্য, শিক্ষা দীক্ষা, আমার শক্তি সামর্থ সবই ত স্বাধীনতা সংগ্রামের দীক্ষা গ্রহণে উৎসর্গ করেচি কিন্তু সুলেখা, মা মরণের সময় যে শেষ দান করে গিয়েচেন তা' যে আমি কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে পারচিনি। হয়ত' এ সংস্কার, হয়ত' এ দুর্ব্বলতা, কিন্তু ভাবীপুত্রবধূকে উদ্দেশ করে যে উপহার দিয়ে গেচেন তা' বিক্রী করতে আমার মন কিছুতেই সরচেনা।

: তোমাকে যে বিক্রী করতে হবে এমন দিব্যি ত' কেউ দেয়নি। তোমার এমন কি অভাব হয়েচে যে মা'র হারছড়া বিক্রি করতে হবে।

: সুলেখা, ঘরে বসে আচিস তাই বুঝতে পারিস না মহামারির ধ্বংশ লীলা। কী বিভৎস, কী ভয়ঙ্কর যে ধ্বংশলীলা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শত শত শ্রমিক ও চাষী বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষা ও বিনা পথ্যে মরচে। মড়াগুলি পোড়াবার কিংবা কবর দেবার লোক পর্য্যন্ত নেই—গলিত শবদেহের দুর্গন্ধে শিয়াল কুকুর

পালিয়ে যাচ্চে। সুলেখা, এদের দুর্দ্দশা আর মৃত্যুর অভিশাপ আমি সহ্য করতে পারচিনি।

সুলেখা কোন কথা বলিতে পারিল না, ভীতার্ত্ত নয়নে চাহিয়া রহিল।

সুমিত বলিয়া চলিল, ওষুদ নেই, ভাল জল নেই, খাদ্য নেই লোক নেই! গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে রোগ ছড়িয়ে যাচ্চে। আমাদের দলের যারা কর্ম্মঠ ছিল তারা সব জেলে। সরকার থেকে যে চিকিৎসক দল এসেচে তারা এত সামান্য এবং তাদের রসদ এত কম যে এত বড় মহামারিতে বিশেষ কোন উপকার হবে না। আমার আংটি, ঘড়ি, বোতাম প্রভৃতি বিক্রী করে—

সুলেখা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, তোমার আংটি, ঘড়ি, বোতাম বিক্রী করেচ!

: আশ্চর্য্য হচ্চিস সু! জমিদারের একমাত্র পুত্র হয়ে আংটি, ঘড়ি বিক্রী করেচি আশ্চর্য্য হবারই কথা। জানিস সুলেখা, ফুলকোয়ারার হার, চুড়ি আংটি বন্ধক দিয়েচি—শেষ পর্য্যন্ত আমাকে তা'ও বিক্রী করতে হয়েচে।

: তুমি বলচ কি দাদা! তুমি পারলে ওর অলঙ্কারপত্র বিক্রী করতে?

: পেরেচি বোন। ফুলকোয়ারা যখন তার শেষ সম্বল অলঙ্কার পত্রগুলি আমার হাতে তুলে দিলে আমি সঙ্কুচিত হয়েছিলুম কিন্তু ফুলকোয়ারা বললে, যারা বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে মরচে তাদের জন্য আমি দিয়েচি। ফুলকোয়ারা আমায় আরও কি বললে জান, বললে ওদের দুঃখ দুর্দ্দশা আর বাড়াবেন না, এ সামান্য সাহায্যটুকু থেকে ওদের

বঞ্চিত করে অভিশাপ কুড়োবেন না। সুলেখা, এর পরও কি আমি দ্বিধা করতে পারি? পারিনি আমি, তাকে নিরাভরণ করে একে একে সকল অলঙ্কার আমি নিয়েছি।

সুলেখা খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত চাহিয়া থাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুমিত বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল সুলেখা পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার পিতা আসিলে হারছড়া লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। সুমিত পিতাকে এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

সুমিত বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইতেই সুলেখা ডাকিল, দাদা, দাঁড়াও।

সুমিত যাইতে পারিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

সুলেখা সুমিতকে পনেরটি টাকা ও একটি ব্রেসলেট দিয়া বলিল, নগদ টাকা আর আমার হাতে নেই। ব্রেসলেটটা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা ধার কর, পরে আমি শোধ করে দেব।

সুমিত অবাক হইয়া বলিল, তুই বলচিস কি সু!

সুলেখা হাসিয়া বলিল, দান করবার মত মহত্ত্ব আমার নেই দাদা, মা'র হাড়ছড়া যাতে খোয়া না যায় সেজন্যই এগুলি দিলাম।

সুমিত বিস্মিত নয়নে সুলেখার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

তিন মাস ধরিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নাই। মাঠের শস্য শুকাইয়া গিয়াছে, ঝোঁপঝাড়ের ধারের ঘাস দূর্ব্বাদলগুলি পর্য্যন্ত মরিয়া গিয়াছে। খাল বিল, পুকুর শুষ্ক, সুগভীর কুয়াতেও জল পাওয়া যায় না। অতি প্রত্যূষে কূপের তলদেশে সামান্য জল জমে। সেই সামান্য জল লইয়া লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। প্রায় সারাক্ষণই কূপের ধারে পিপাসার্থ লোক বসিয়া থাকে। কূপে জল জমিবার অবকাশ মিলে না।

কয়েকটি নলকূপ আছে। বহু দূরস্থ গ্রাম হইতে লোক নলকূপের জল লইবার জন্য আসে। নলকূপের নিকট এত ভিড় হয় যে, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়াও জল নেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তারপর নলকূপ হইতে এত বেশী জল বাহির করা হয় যে, প্রায়ই নলকূপের পাম্প নষ্ট হইয়া যায়।

গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। লোকজন আছে কি নাই বোঝা যায় না। রাস্তাঘাটে বিশেষ লোক চলাচল করে না। বাজারের দোকানগুলি বন্ধ, যে দুই চারিটা দোকান খোলা থাকে তাহাও ক্রেতাদের অভাবে খাঁ খাঁ করিতেছে। পূর্ব্বে হাটবারে লোকে লোকারণ্য হইত, রাস্তায় এত ভীড় হইত যে গাড়ী চলা দুষ্কর হইত; এখন আর হাটে লোকের ভীড় হয় না, পথেও বিশেষ লোকজন দেখা যায় না। যে সামান্য

কয়েক জন লোক হাটে আসে তাহারা যেন হাটকে বিদ্রূপই করে।

প্রায় গৃহেই রাত্রে বাতি জ্বলে না। যে সকল হতভাগ্য এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারা যেন গাঢ় অন্ধকারে প্রিয়জনের বিরহে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকে। রোগে, শোকে ও বুভুক্ষায় সারাক্ষণ অস্ফুট কাতরধ্বনি করে। তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক, প্রাণ নিষ্প্রভ, আশা আকাঙ্খা সব মৃত। তাহারা শুধু জড়সড় হইয়া পড়িয়া থাকে, কোন কিছু ভাবিতে পারে না, প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেও পারে না।

মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা হ্রাস পাইয়াছে। কদাচিত দুই একটি লোক মারা যায়। তাহাদের পোড়াইবার কিংবা কবর দিবার লোক পাওয়া যায় না।

কুলি বস্তিতে মহামারি থামিয়া গিয়াছে কিন্তু মিল মালিকদের সহিত তাহাদের বিরোধ মিটে নাই। ভিন্ন স্থান হইতে শ্রমিক আসিয়াছে, কৃষকরা নিরুপায়ে লাঙ্গল কাস্তে ফেলিয়া মিলে যোগ দিয়াছে। শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভাড়াটে শ্রমিক দ্বারা পুনরায় সচল হইয়া উঠিয়াছে। মহামারির জন্য ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা এতদিন কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। রোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভাড়াটে শ্রমিক দ্বারা মিলে রীতিমত কাজ চলিতে থাকায় এবং ধর্ম্মঘটীদের সকল দাবী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হওয়ায় ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ধর্ম্মঘটীদের তরফ হইতে পুনরায় আপোষ মীমাংসার চেষ্ট হইয়াছিল কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। মালিকগণ বিনা সর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিবার দাবী করিলেন।

শ্রমিকগণ এতকাল অহিংসই ছিল। যদিও তাহারা অন্তরে অহিংস নয় কিন্তু শ্রমিক নেতা ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের চেষ্টায় তাহারা কাজে কর্ম্মে অহিংস নীতি মানিয়া চলিত। এই চরম দুর্দ্দিনে তাহাদের সংযত করিয়া রাখিতে পারে এমন কর্ম্মী আর বাহিরে নাই। সুমিত ভিন্ন অপর সকল কর্ম্মীই বর্ত্তমানে কারারুদ্ধ এবং এ অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত। একে রোগ, শোক, অভাব ও মহামারিতে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের স্বভাব হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, তারপর ভাড়াটে শ্রমিকগণ যখন তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল তখন তাহারা আর অহিংস থাকিতে পারিল না। অপর কোন পথ না পাইয়া নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসার পথ গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইল।

সুমিত তাহাদের সংযত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাদের কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলনা। সুমিত যদি এই সকল নিরন্ন শ্রমিকের বুভুক্ষার দাহ মিটাইতে পারিত, রোগে ঔষধ ও পথ্য দিতে পারিত তবে তাহারা হয়ত শান্ত হইতে পারিত, কিন্তু সুমিত এই সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার দাবী মিটাইতে পারিল না।

সুমিত ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের ভবিষ্যত ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। শ্রমিকরা যে পথ গ্রহণ করিতে উন্মত্ত হইয়াছে তাহার যে কি শোচনীয় পরিণাম হইবে তাহা বুঝাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল কিন্তু শ্রমিকরা ভীত হইল না। শ্রমিকরা জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলার চেয়ে কারাবরণ—এমন কি প্রাণ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

ধর্ম্মঘটীদের শান্ত করিতে না পারিয়া সুমিত ফুলকোয়ারার শরণাপন্ন হইল।

ফুলকোয়ারা খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, আপনি সকলকে সমবেত করুন, আমি গিয়ে ওদের বোঝাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সুস্মিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি ওদের কাছে যাবে? তোমার পিতা, তোমার সমাজ—

ফুলকোয়ারা হাসিয়া জবাব দিল, এতগুলি লোকের সর্ব্বনাশের চেয়ে আমার পিতা, আমার সমাজ, আমাদের কুসংস্কার বড় নয়।

: এর জন্য তোমায় অনেক পীড়ন সইতে হবে ফুলকোয়ারা!

: এতগুলি লোকের জন্য যদি আমাকে পীড়ন সইতে হয় তবে তা' আমার গৌরবের কথা হবে, সুখের বিষয় হবে। আপনি আমার জন্য ভাববেন না, আমি এবার প্রাচীর অতিক্রম করে প্রান্তরে যেতে চাই। আপনি আমায় এ সুযোগ দিয়ে আমায় মানুষ হবার সুযোগ দিন।

: ভেবে দেখ ফুলকোয়ারা, তুমি যে পথ গ্রহণ করতে চাচ্ছ তা কত বন্ধুর, কত ভয়ানক। তুমি যুবতী নারী—তোমাদের ক্ষণভঙ্গুর মান মর্য্যাদা আছে, অনায়াসলভ্য কলঙ্ক আছে, আর তোমাদের সুমুখে অন্ধকার ভবিষ্যতের মানে আশ্রয়হীন স্থানের রাজপথগুলি উন্মুক্ত রয়েচে। ফুল, তোমার এত সহজে বেরিয়ে আসা সুবিবেচনার কাজ হবে না, তোমার অবস্থা সাধারণের মত নয়।

: আমি এত কথা ভাবতে পারছিনি। আপনাকে অনুরোধ করচি, আমায় আর ভয় দেখাবেন না। যে ভাবেই হোক আমাকে এ দাঙ্গাহাঙ্গামা রোধ করতেই হবে। আমি দিদিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।

: প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে?

: হ্যাঁ! দিদি যাবার বেলায় শ্রমিকদের আমার হাতে সঁপে গিয়েছিলেন। আমাকে আজ এদের রক্ষা করতেই হবে। আর সময় নেই, তাই গোপনে না গিয়ে আমাকে প্রকাশ্য সভায় যেতে হবে।

: বেশ, তাই হবে।

: এখনই আমায় নিয়ে চলুন।

: সভার এখনও দেরি আছে।

: তা' জানি, কিন্তু আমাকে এখনই বের হতে হবে। বাবা বাড়ি ফিরবার আগেই আমাকে সরতে হবে। আমি প্রস্তুত, চলুন।

সুমিত ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়া গেল, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, এ ভাবে আমার সঙ্গে তুমি প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে যেতে চাও।

ফুলকোয়ারা হাসিয়া বলিল, তবে কি পালকীতে চড়ে যাব।

: তা' নয়, তবে—

: লোক লজ্জার ভয় করচেন? আমি মেয়েমানুষ আমার ভয় হচ্চে না আর আপনি ব্যাটাছেলে হয়ে ভয় করচেন। ভয় নেই চলুন, আমি পর্দ্দানশীন মহিলা ছিলুম, রাস্তার লোক আমায় চিনতে পারবে না। দিদির হাত ধরে যদি আপনি চলতে পারেন তবে আমি আপনার পাশে দাঁড়ালে বিশেষ কোন লজ্জার কারণ হবে না।

ফুলকোয়ারা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সুমিতের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, চলুন!

বস্তির ধারে পড়া জমিটায় শ্রমিক সভা বসিয়াছে।

পুলিশের অনুমতি ব্যতীত এ অঞ্চলে সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

শ্রমিকরা কোন অনুমতি না লইয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছে।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছে। পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও সুমিত সভা ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই পুলিশ নিরুপায়ে সুমিতকে গ্রেপ্তার করিল।

সুমিতকে গ্রেপ্তার করায় শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। শ্রমিকরা যাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া হিংসার পথ গ্রহণ না করে সেজন্য ফুলকোয়ারা তাড়াতাড়ি বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইল।

ফুলকোয়ারা বলিল, ভাইগণ!

উত্তেজিত শ্রমিকগণ সহসা চুপ করিয়া গেল, শান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

পুলিশ ফুলকোয়ারাকে চিনে না। অকস্মাৎ একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী নারীকে এমনি নির্ভীকভাবে সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। সভা ভঙ্গ করিতে অস্বীকার করিলে সুমিতকে গ্রেপ্তার করিবার নির্দ্দেশ পুলিশ পাইয়াছিল কিন্তু কোন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিবার নির্দ্দেশ পায় নাই। এমন সমস্যা যে দাঁড়াইতে পারে তাহা পুলিশ ভাবিতে পারে নাই।

ফুলকোয়ারা বিনা বাধায় আবেগকণ্ঠে বক্তৃতা করিয়া চলিল। ফুলকোয়ারা বলিয়া চলিল, ভাইগণ, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখবেন যে, কখনও যেন আপনারা অহিংসার পথ থেকে একটু বিচ্যুত না হন। আপনাদের হিংসার পথে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা করা হচ্ছে, আপনাদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সর্ব্বদা এ কথা মনে রাখবেন হিংসার পথে আপনাদের জয় নয়—আদর্শচ্যুত হলে আপনারা বিরাট

শক্তির চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবেন। সুমিতবাবু গ্রেপ্তার হলেন, আমিও হয়ত গ্রেপ্তার হব, আমার পর আপনাদেরই পর পর এ ভার গ্রহণ করতে হবে—!

অকস্মাৎ আক্রাম মিঞা সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কামানের গোলার মত ফাটিয়া পড়িয়া ফুলকোয়ারাকে বলিলেন, হারামজাদী, তুই কুলত্যাগ করেচিস, আমার বংশে এত বড় কলঙ্ক দিয়েচিস। কার প্ররোচনায় তুই আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করলি ?

ফুলকোয়ারা কোন ভ্রূক্ষেপ করিল না, ভাবের আতিশয্যে বক্তৃতা করিয়া চলিল।

'নেবে আয়'.'নেবে আয়'বলিতে বলিতে আক্রাম মিঞা সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রমিকরা যত বাধা দিতে লাগিল, আক্রাম মিঞার ততই ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আক্রাম মিঞা শ্রমিকদের গালাগালি দিয়া বলিলেন, এরাই আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করেচে। আমি এদের দেখে নেব।

শ্রমিকদের গালাগালি করায় শ্রমিকরা আক্রাম মিঞার উপর চটিয়া উঠিল।

ফুলকোয়ারা অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াইবার জন্য শ্রমিকদের শান্ত হইতে বলিল।

আক্রাম মিঞা ফুলকোয়ারাকে বলিলেন, চলে আয়, চলে আয় বলচি।

ফুলকোয়ারা অস্বীকার করায় আক্রাম মিঞা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, ভালয় ভালয় বলচি চলে আয়, নইলে তোরই একদিন আর আমারই একদিন। এখনও বলচি আয় নয়ত খুন করে ফেলব হারামজাদী!

ফুলকোয়ার শান্তভাবে জবাব দিল, আপনি মিছিমিছি রাগ করচেন। আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেচি।

আক্রাম মিঞা ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, আমি জানতে চাই তুই যাবি কিনা!

ফুলকোয়ারা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, না!

: না! আক্রাম মিঞা ফাটিয়া পড়িয়া বলিলেন, শেষ বার বলচি, এখনও চলে আয়! নইলে আমার বাড়িতে আর ঢুকতে দেব না।

ফুলকোয়ারা তথাপি দৃঢ় কণ্ঠে অস্বীকার করিল।

আক্রাম মিঞা সভাস্থল কাঁপাইয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। যাহারা কুবুদ্ধি দিয়া এত বড় সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাদের তিনি দেখিয়া লইবেন। এবং ফুলকোয়ারাকে শেষ পর্য্যন্ত তাহার বাড়ীতে যাইতেই হইবে তখন তিনি তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিবেন; অতঃপর শ্রমিকদের গালাগালি সুরু করিতেই শ্রমিকরা রুখিয়া উঠায় আক্রাম মিঞা অভিশাপ দিতে দিতে প্রস্থান করিলেন।

পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। ফুলকোয়ারা মিল সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে বেশিক্ষণ বক্তৃতা করিবার অবকাশ পাইল না, দারোগা সাহেব নিজে আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন।

ফুলকোয়ারাকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ শ্রমিকদের সভাস্থল ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিল। শ্রমিকরা আদেশ অমান্য করায় পুলিশ লাঠি চালনার উপক্রম করিতেই অকস্মাৎ মহকুমা হাকিমের গাড়ী আসিয়া সশব্দে থামিল।

শ্রমিকরা যে ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, মহকুমা হাকিম আসিয়া বাধা না দিলে পুলিশে-শ্রমিকে একটা ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া যাইত।

মহকুমা হাকিমের গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে আরেকটি গাড়ী আসিয়া থামিল এবং গাড়ী হইতে সীমন্তী ও মাষ্টারমশাই অবতরণ করিলেন।

সীমন্তীকে দেখিয়া শ্রমিকরা উল্লসিত হইয়া জয়ধ্বনি করিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সকল গোলযোগ থামিয়া গেল। পুলিশ শ্রমিক-দের সভা করিবার জন্য অনুমতি দিল এবং ফুলকোয়ারাকে ছাড়িয়া দিল।

ফুলকোয়ারার সঙ্গে সীমন্তীর বিশেষ কোন কথা হইল না। সীমন্তী ও মাষ্টারমশাই যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ মহকুমা হাকিমের সহিত চলিয়া গেলেন। ফুলকোয়ারা এবং সমস্ত লোকজন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কি করিয়া সীমন্তী এখানে আসিল, কোথায় বা চলিয়া গেল এবং পুলিশের সঙ্গে কি করিয়াই বা বন্ধুত্ব হইল তাহার কোন উত্তর পাইল না। এত বড় রহস্যটা যেন সীমন্তীর আকস্মিক প্রস্থানে এবং কঠিন বাক সংযমে জটিলতর হইয়া উঠিল। সীমন্তী যাইবার পূর্ব্বে ফুলকোয়ারাকে শুধু বলিয়া গেল, কংগ্রেস অফিসে যেও, সকল কথা জানতে পারবে।

শ্রমিক গোলযোগ সম্পর্কে যে সকল নেতা কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাহারা বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং যাহাদের উপর বহিষ্কার ও অন্তরীণের আদেশ হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

শ্রমিক গোলযোগেরও মীমাংসা হইয়াছে। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা বিনা সর্ত্তে কাজে যোগদান করিবে, পরিবর্ত্তে মালিকগণ কোন ধর্ম্মঘটী শ্রমিককে

কর্ম্মচ্যুত করিবেন না। মালিক পক্ষের তিনজন, শ্রমিক পক্ষের তিনজন এবং সরকার পক্ষের তিনজনকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে। কমিটি তদন্ত করিয়া মালিকদের সুপারিশ সহ রিপোর্ট দাখিল করিলে মালিকগণ তাহা সুবিবেচনা করিয়া কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন।

সীমন্তীর আপ্রাণ চেষ্টায় কয়েকদিনের মধ্যে কিষাণ শ্রমিকদের দুঃখ অভাব অনেক লাঘব হইয়াছে। বিনা সুদে তাহাদের ঋণ দেওয়া হইয়াছে, বহু গরীব দুঃখী লোকদের চাল ও ডাল সাহায্য করা হইতেছে।

সীমন্তীর এখানে আসার পর হইতে মুবলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। প্রবলধারে বারিপাত হওয়ায় সকল রোগ যেন ধুইয়া চলিয়া গিয়াছে, শোকও অনেক প্রশমিত হইয়াছে।

মহামারি থামিয়া গিয়াছে; লোক অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, খাদ্য পাইয়াছে। যাহারা আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদের প্রাণে পুনরায় বাঁচিবার আশা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পর লোকের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে পথঘাট মাঠ শুকাইয়া মরুভূমি হইতে চলিয়াছিল, যে ঝোঁপ-জঙ্গল জ্বলিয়া যাইতেছিল, যে খাল বিল জলাশয়ে উত্তপ্ত বালি উড়িতেছিল তাহা আবার জীবন্ত হইয়া উঠিল। পথঘাটে এখন আবার লোক চলাচল করে, মাঠে ঘাস জন্মিতেছে, সেখানে গরু ঘোড়া বিচরণ করে, ঝোঁপ-জঙ্গলগুলি আবার সবুজশ্রী ধারণ করিতেছে এবং খালবিলে জল জমিয়াছে।

সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, হাসি ফুটে নাই শুধু কংগ্রেস ও কিষাণ কর্ম্মীদের মুখে। দেশের সর্ব্বত্রই মিলনের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কিষাণ ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে যেন ভাঙ্গনের সুর

তীব্র হইয়া উঠিতে চায়।

সীমন্তী এই আসন্ন বিরোধ দমন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সীমন্তীর আপোষ মনোভাব এবং আপোষের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা স্থমিত সমর্থন করিতে পারিল না এবং এই বিরোধী কর্ম্মনীতি লইয়া দুই দলের বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য ও আসন্ন হইয়া উঠিল।

কংগ্রেস অফিসে কর্ম্মীদের সভা বসিয়াছে। সীমন্তীর কর্ম্মপন্থা সমর্থন করিয়া আলতাফ, সুরঞ্জন, জগদীশ প্রমুখ বহু কর্ম্মী জোরালো বক্তৃতা করিয়াছে এবং পাণ্টা স্থমিতের সংগ্রামাত্মক নীতি সমর্থন করিয়া ফুল-কোয়ারা, আশীষ প্রমুখ বহু কর্ম্মী বক্তৃতা করিল।

আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতে করিতে আলোচনাটা শেষ পর্য্যন্ত উত্তেজনায় ও ক্রোধে পরিণত হইল। আলোচনটা ব্যক্তিবিশেষেব উপব ক্রমশ: মোড় ঘুরিতেছে দেখিয়া স্থমিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বন্ধুগণ আপনারা এখানে কর্ম্মপন্থা স্থির করতে এসেচেন, ব্যক্তি বিশেষের আচরণ সমালোচনা করতে আসেন নি। আমি কিংবা সীমন্তী দেবী কংগ্রেস নই, কর্ম্মপন্থাও নই। মহামারীর সময় সীমন্তী দেবী এখানে আসেননি, সত্যাগ্রহে যোগ দেননি এবং আমি জেলকে এড়িয়ে চলেচি—এ সকল প্রশ্ন আজকের সভায় বিবেচ্য নয়।

স্থমিত বলিয়া চলিল, সীমন্তী দেবী বৃহত্তর কাজে ছিলেন বলে এখানে আসতে পারেন নি—এ সত্যি কথা উত্তেজিত হয়ে ভুললে ক্ষমা করা যায় না। আমি জেলকে এড়িয়ে চলেচি; একথা আমি অস্বীকার করব না, আমি যদি জেলে যেতুম তবে সামান্য সাহায্যটুকু হ'তে

ধর্ম্মঘটীরা বঞ্চিত হত। অবশ্য এ কথা আমি বলচিনি যে, আমি সফল হয়েচি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেচি এবং সাহায্য করতে পারব এ আশা ছিল বলে জেলকে এড়িয়ে চলেছিলুম। আমরা কেউ না থাকলে এরা হিংস হয়ে উঠত, এ কথা সম্ভবত আপনারা বিশ্বাস করেন।

সীমন্তী একটু আহত হইয়া বলিল, এত বড় অবিশ্বাস ত' কখনও তোমার ছিল না।

সুমিত বলিল, তোমার কর্ম্মপন্থায় আমার আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস তুমি মাষ্টার মশায়ের পরামর্শ মত যে ভাবে কংগ্রেসকে চালিত করচ তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। যে কর্ম্মপন্থার উপর আমার অতটুকু বিশ্বাস নেই, এমন কি ভুল বলে মনে করি তা' শত অনুরোধেও আমি মানতে পারিনে।

সীমন্তী বলিল, মীমাংসা কি হতে পারে না? তুমি ইচ্ছা করলে এখনও এত বড় ভাঙ্গনকে রোধ করতে পার।

ঃ তা' হয় না সীমন্তী। হয় তুমি কংগ্রেসকে তোমার নীতি অনুসারে চালাও নয়ত আমাদের সে ভার নিতে হবে। ভোট তুমি নাও।

সীমন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর ভাবে বলিল, বস্তুত সুমিতবাবু আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেচেন। প্রত্যেকেই অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন—এতে রাগ করবার কিংবা দুঃখিত হবার কারণ নেই। সুমিতবাবু যদি কংগ্রেসকে চালিত করতে চান—করুন, আমি সাধারণ কর্ম্মীর মত তাঁর আদেশ মেনে চলতে প্রস্তুত আছি। আমি কেন আপোষ মীমাংসা করেচি তা' আপনাদের বলেচি। যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা'তে আপোষ মীমাংসা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। জাতিকে প্রস্তুত না করে

ধ্বংশের মধ্যে ঠেলে দেওয়া সংগ্রাম হতে পারে কিন্তু সুবিবেচনার কার্য্য হয় না। সুমিতবাবু তীব্রভাবে আমার নীতির সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ কথা আপনাদের ভুললে চলবে না যে, সেন্টিমেণ্ট রাজনীতি নয়।

ফুলকোয়ারা বলিল, এত ত্যাগ, এত দুঃখ কষ্ট বরণের পর যে সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করছিল তা' হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া রাজনীতি হতে পারে কিন্তু সে রাজনীতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। গণআন্দোলন আমরা চেয়েছিলুম, আমাদের আন্দোলন ক্রমশঃ গণআন্দোলনে পরিণত হচ্চে দেখে তা' এমন কৌশলে বন্ধ করে দেওয়া যে রাজনীতি সে কথা অস্বীকার করিনে। তবে আপনি যাকে আপোষ মীমাংসা বলছেন তা' আপোষ মীমাংসা নয়, বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ! আপনি এবার প্রস্তাবটি ভোটে দিন।

সীমন্তী খানিক বক্তৃতা করিয়া প্রস্তাবটি ভোটে দিল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইল।

সুমিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সীমন্তী দেবীর জয়লাভে আমি তাঁকে অভিনন্দিত করচি। অধিকাংশ সদস্য যখন তাঁর নেতৃত্ব কামনা করেন তখন আমি সে সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। আমার পরাজয়ে এ কথা প্রমাণিত হোল না যে, আমার নীতি ভুল এবং সীমন্তী দেবীর নীতিই ঠিক। জনসাধারণ বিচার বুদ্ধির দ্বারা চলে না, তারা ব্যক্তিকে পূজা করে এবং তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। আমি ভবিষ্যতে কি পন্থা গ্রহণ করব জানিনে, তবে যতক্ষণ সীমন্তী দেবীর নির্দ্দেশ মেনে চলা সম্ভবপর হবে মেনে চলব, যখন পারব না তখন নিরপেক্ষ থাকব এবং প্রয়োজন হলে বাধা দেব।

তারপর সুমিত দলবল সহ প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সীমন্তী এত দুঃখ কষ্ট, এত নির্য্যাতন পীড়ন সহ্য করিয়া এবং এত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা যে চরম লক্ষ্যের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে, তাহা সে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই। এমন কি ভুল সে করিয়াছে, এমন কি দুর্নীতি ঢুকিয়াছে যাহার জন্য এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির এমন ভাবে ভাঙ্গন সুরু হইল। কর্ম্মীদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সফল হইতে পারে নাই। বরঞ্চ যাহা চাপা দেওয়া ছিল তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদিন তবু ঐক্য ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা ছিল কিন্তু গত অধিবেশনে সব আশাই নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। ঢাকা চাপা দিয়া কিংবা এড়াইয়া চলিবারও আর কোন পথ নাই।

সীমন্তী একটা আপোষ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু মাষ্টারমশাই কোন আপোষ করিতে রাজি হন নাই। মাষ্টারমশাই বলেন, কর্ম্মীদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তুমি যে চেষ্টা করচ তার জন্যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব কিন্তু তুমি যে ভাবে আপোষ রক্ষা করতে চাচ্চ তার প্রশংসা করতে পারি না, এমন কি তাতে তোমার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব প্রকাশ পাচ্চে।

: কিন্তু তা' ভিন্ন উপায় কি ? নিজেদের মধ্যে যদি মতবিরোধ নিয়ে

একটা বিচ্ছেদ ঘটে তবে কত বড় ক্ষতি হবে একবার ভাবুন ত'।

: জানি। মস্ত বড় ক্ষতি হবে তা'ও বুঝি কিন্তু সীমন্তী একথা তোমায় বুঝতে হবে যে, বিরোধী-নীতির মিলন ঘটতে পারে না।

: কিন্তু আমাদের সকলের আদর্শ [illegible] ত' এক!

: আদর্শ এক, উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু নীতি ও কর্ম্মপন্থা এক নয়। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি জাতি একই উদ্দেশ্যে পূজা, নমাজ, আরাধনা প্রভৃতি করে কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে ওদের [illegible] মিলন হয়নি—হবে না। কর্ম্মপদ্ধতির বিশ্বাস ও আত্মচেতনা মানুষের [illegible] ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিপক্ষ দলকে যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাস না জন্মাতে পারবে, যে পর্য্যন্ত শুভ চেতনা জাগিয়ে না তুলতে পারবে সে পর্য্যন্ত কোন রকমেই সফল হতে পারবে না। যেমন হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের চোদ্দ দফা শত দফা করে দিলেও ঐক্য হবে না, কারণ শত দফা রক্ষা করতে হবে হিন্দুদের এবং কার্য্যক্ষেত্রে দফাগুলি রক্ষিত হবে কিনা তা বিশ্বাস করতে হবে মুসলমানদের। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় যেমন হিন্দুদের দায়িত্ব তেমনি প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবার মনোভাব সৃষ্টি করার দায়িত্বও মুসলমানদের।

সীমন্তী একটু ভাবিয়া বলিল, বিশ্বাস ও আন্তরিকতা না থাকলে কখনও প্রকৃত ঐক্য হতে পারে না। এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু বিশ্বাস ও আন্তরিকতার জন্য চেষ্টা ও সময়ের প্রয়োজন।

: সেত' সত্যই। তবে জান কি মা মুখের কথায় বিশ্বাস ও আন্তরিকতা আনা যায় না, কাজে আনাতে হয়। ওদের যদি অনুপ্রাণিত করতে পার, আন্তরিক বিশ্বাস জন্মাতে পার তবেই প্রকৃত মিলন হবে—কোন

চুক্তিতে নয়। হয় তোমাদের নীতিতে কাজ চলবে নয় ওদের নীতিতে, কিন্তু ভাঙ্গনের ভয়ে কখনও কর্ম্মপন্থা এলোমেলো ও শিথিল হতে পারে না এবং নীতিও অস্পষ্ট থাকতে পারে না।

গত সভার অধিকাংশ সদস্য তোমার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেচে, অতএব তোমাকেই দৃঢ়ভাবে কাজ করে যেতে হবে। চরমপন্থী দল যদি তোমার কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হয় তবে তাদের নীরব থাকতে হবে, বাধা অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার অধিকার নেই কারণ ওরাও তোমাদের মতই দেশসেবী।

: কিন্তু—

: কর্ত্তব্যে কিন্তু নেই। তুমি যদি বোঝ যে, তুমি এ সঙ্কটকালে কংগ্রেসকে ঠিক পথে চালিত করতে পারবে না এবং সদস্যগণ তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তোমার প্রতি অসঙ্গত আস্থা জ্ঞাপন করেচে তবে পদত্যাগ কর। চরমপন্থীদের কর্ম্মপন্থা যদি গ্রহণ করতে পার তবে ত' ভালই নইলে তোমাকে সরে দাঁড়াতে হবে। সুমিতের নীতির আমি নিন্দা করচি নে। ওরা কর্ম্মী, ওরা চায় বিপ্লব। ওরা মিলে ধর্ম্মঘট বাধিয়ে যে ষোল আনা ক্ষতি করেচে তা আমি বলিনে, কৃষকদের ক্ষেপিয়ে দিয়েও খুব বড় ক্ষতি করেনি। দুঃখ দারিদ্র্য ও অত্যাচারে ওদের অগ্নি-পরীক্ষা হয়েচে—মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ জাতির মধ্যে একটু হলেও আত্মচেতনা জাগবে, মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম জাগবে।

: সংগ্রামের মধ্যেই ত' মেরুদণ্ড গড়ে উঠে, পায় মানুষ হবার আলোক।

: তা সত্য মা। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েচে রাশিয়া। ধ্বংশের

মধ্যেই সূচনা হয় সৃষ্টির। কিন্তু তোমার এ কথা মনে রাখা উচিত যে হিংসাত্মক কার্য্যে অথবা আক্রমণে শক্তি ও সামর্থের যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অহিংসাত্মক আক্রমণ অথবা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে আত্মশক্তি ধৈর্য্য ও সাহসের বেশি প্রয়োজন হয়।

: তা' হয়ত সত্যি! সীমন্তী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুমিত বাবুর মত এত বড় কর্ম্মীকে হারান—

: উপায় নেই। কর্ম্মক্ষেত্রে এ অবস্থায় তোমাদের মিলন হওয়া শক্ত।

মাষ্টারমশাই প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, শুনেচ বোধ হয় যে, সুমিত জমিদারী পাবে না, এমন কি মাসহরাও পাবে না।

: ওঁর কি করে চলবে?

: কি করে চলবে জানিনে, তবে সুমিত দু'এক দিনের মধ্যেই বাড়ির সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে বাস করবে।

: আশীষ বলে, আলতাফ ও ফুলকোয়ারাকে নাকি ওর বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েচেন।

: ফুলকোয়ারা এখন কোথায় আছে?

: টগর বোষ্টমীর বাড়িতে।

: ওকে পীড়ন করবে না? মুসলমান মেয়েকে আশ্রয় দিতে সাহস পেলে?

: টগর ভয় করে না, বলে, দশবার স্বামী বদলিয়েচি ভয় করি কাকে। কেউ বল্‌লেই হল, সোমত্ত বয়সের মেয়েকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচে, যদি একটা ভাল মন্দ কিছু হয় তখন কি উপায় হবে? টগর বোষ্টমীর wonderfull change হয়েচে।

: কিন্তু ফুলকোয়ারা তোমার কাছে এল না কেন ?

: যেদিন ওকে তাড়ায় সেদিন আমি এখানে ছিলুম না কাকু। উগবাকে বিশ্বাস করতে পারেন, ও এখন সত্যি বড় ভাল মানুষ হয়ে গেচে।

কদম গাছটার গা বাহিয়া মাধবীলতা আঁকিয়া বাঁকিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। দুই তিনটি ভ্রমর ইতঃস্তত ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

সুমিত বহুক্ষণ ধরিয়া মাধবীলতার দিকে চাহিয়াছিল; তাহার মনে হয়, ইহাই হয়ত' ইহাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষ কথা নয়। যাহার জন্য ইহারা বিকশিত হয়, যাহার জন্য ইহাদের যৌবন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাহাকে ইহারা সজ্ঞান অনুভূতিতে পায় না।

মাধবীলতার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সুমিতের মনে হইল, মানুষ মানুষকে ভালবাসে আত্মার চেতনাহীন অনুপ্রেরণায়। মানুষ না ভালবাসিয়া পারে না, আত্মাই তাহাকে ভালবাসায়। মানুষের আত্মা পূর্ণ নয়—বৃহত্তর আত্মার অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের অংশ বিশেষ, সেজন্যই আংশিক আত্মা পরিপূর্ণ হইতে চায়। পরিপূর্ণতা লাভ করিবার স্বাভাবিক ও স্বকীয় গতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনিবার্য্য ও অপ্রতিহত ধারা। মানুষের আত্মা আপনাতে পূর্ণ হইতে পারে না বলিয়াই অপরকে ভাল বাসে এবং অপর আত্মার সহিত মিশিয়া যাইতে চায়। সেইজন্য মানুষ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বন্ধু বান্ধবদের ভালবাসে। আত্মার যত বিকাশ পাইতে থাকে ততই ভালবাসার গণ্ডি অসীমের দিকে ছড়াইয়া যাইতে থাকে। যে মানুষ বিশ্বমানবতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

আপনাকে আপন করিয়া বিলাইয়া দিতে পারে তাহার আত্মাই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সীমন্তী কোথায়ও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়াছে। হঠাৎ সুমিতকে ঘাসের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, সুমিত যে! কি খবর? এতদিন কোথায় ছিলে?

সুমিত একবার সীমন্তীর দিকে চাহিয়া পুনরায় মাধবীলতা কুঞ্জের দিকে চাহিল, কোন কথা কহিল না।

সীমন্তী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ সুমিত?

: ভাবচি! সুমিত কথাটা যেন ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া গেল।

সীমন্তী সুমিতের পাশে আসিয়া বসিল এবং সুমিতের একটা হাত নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, কি ভাবচ অত?

সুমিত গভীর নয়নে সীমন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, কত কি ভাবি! ভাবতে চাইনে, তবু আমায় ভাবায়। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সচল এবং অন্ধচোখে যা কিছু অচল সবইত' শাশ্বত। আঘাত দিয়ে যিনি আঘাতের মধ্যে আনন্দ পান, ধ্বংসের খেলায় যিনি সৃষ্টির অমৃত রস প্লাবিত করে তাঁকে আমরা কত ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে রহস্য করি। যার জন্যে আমাদের হাসিকান্না, সুখ দুঃখ, সৌন্দর্য্য-কুৎসিত, মাধুর্য্য-অমাধুর্য্য তাকেই আমরা ভুলে থাকি, উপলব্ধি করতে পারি না। চেতনাহীন অনুভূতি এর চেয়ে বড় শোচনীয় অবস্থা আর নেই সীমন্তী।

সীমন্তী বলিল, সচেতন উপলব্ধির মধ্যে আমরা যাদের পাই তাদের মাঝে যদি তিনি প্রতিবিম্বিত না হন তবে অভিযোগ করব কার কাছে?

: বস্তুর মাঝেই যাদের পরিসমাপ্তি, তাদের অভিযোগ করা চলে না।

: তা' হয়ত সত্য। সুমিত, ভালবাসাই তোমার সত্যিকারের প্রকৃতি, কিন্তু তোমার এত আক্রমণাত্মক নীতি কি করে হল? সেদিন সভায় তুমি যে জোর দিয়ে আমাদের নীতির নিন্দে করলে তাতে আমার ভীষণ ভয় হয়েছিল। তোমার মত ভাবুক, ভাবপ্রবণ ও প্রেমিক লোক কি করে এমন বিপ্লবাত্মক ও সংগ্রামাত্মক নীতির জন্য এমন ভাবে দুর্ব্বিনীত হতে পারে?

: আমি নিজেও বুঝতে পারিনে। আমি দুর্ব্বল, আমি কল্পনা বিলাসী ভাবপ্রবণ যাকে বলে সেন্টিমেণ্টাল অথচ মাঝে মাঝে আমি এমন শক্তি পাই তখন মনে হয় আমি একাই সব কাজ করতে পারি। দুর্যোগের মধ্যে আমার মন টেনে নিতে চায়। বহু স্বাধীন দেশ দেখেচি বহু স্বাধীন দেশের ইতিহাস পড়েচি, ওদের স্বাধীন চিন্তা ও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করেচি এ হয়ত তারি একটা প্রতিক্রিয়া। আর ভাবপ্রবণতা, দুর্ব্বলতা, অসহায়তা ও শঙ্কট মুহূর্ত্তে ঠিক পথে চলার সংশয় ও দুর্ব্বলতা পেয়েচি পরাধীন জাতির বংশধর বলে।

সুমিত সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়া চলিল, ধর্ম্মঘট করে হয়ত ভাল করিনি কিন্তু এ ছাড়া কি পথ ছিল? ভিক্ষা করে অধিকার করা যায় না। হয়ত ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হয়েচে কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে নিপীড়িত ও শোষিত জাতি পেয়েচে প্রাণের স্পন্দন। সর্ব্বহারা ও মেরুদণ্ডহীনকেই করতে হয় সংগ্রাম এবং সংগ্রামের মধ্যেই মেরুদণ্ড গড়ে ওঠে, ন্যায্য পাওনার অধিকার করবার পথ হয় সুগম। সে যাহোক মত ও পথ নিয়ে আর তর্ক করতে চাইনে, যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক হয়ে গেচে। তোমার জয়ে আমি একটুকুও ক্ষুণ্ণ হইনি, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েচি—অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সীমন্তী বলিল, তুমি আমার আচরণের তীব্র নিন্দা করেচ, আমাদের কর্ম্মপন্থা নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে চলচে বলে অভিযোগ করচ কিন্তু আমি যখন ধর্ম্মঘট বন্ধ করি তখন কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা একবার ভাবচ না। মহামারিতে সব মরছিল, ক্ষুধার তাড়নায় সব চুরি ডাকাতি করছিল, শিয়াল কুকুরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিল, দেশ ছেড়ে সব পালাচ্ছিল।

: তাইত' চেয়ে ছিলাম। দম্ভ ও অমানুষিকতার মেরুদণ্ড আত্মাহুতিতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলুম।

: কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারতে না। তোমাদের প্রত্যক্ষ ও দুর্ব্বিনীত আক্রমণে ওদের একগুঁয়েমি পর্ব্বতের মত দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। আন্দোলন চালাবার, সেবা করবার কোন লোক ছিল না। শুধু কাকু নয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি পর্য্যন্ত তোমাদের আক্রমণাত্মক ও আপোষ-হীন নীতির তীব্র নিন্দা করেচে। আজ কাগজ পড়েচ?

: সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি বর্জ্জন করে বরাবরই পড়ে থাকি, আজও পড়েচি। Newspaper's comments are fool's gospel. দল বিশেষের বিজ্ঞাপন অথবা প্রশস্তি এবং বিরোধী দলের খিস্তি পড়বার মত এত সময় আমার নেই।

স্মিত ঘড়িতে সময় দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, তোমায় দেরী করে দিলুম কিন্তু সীমন্তী।

সীমন্তী বলিল, না, না বস। আমার তেমন কোন কাজ নেই তার চেয়ে বরঞ্চ তোমার সঙ্গে বেশি প্রয়োজন। কাকাবাবুর সঙ্গে আজও আমার কথা হয়েচে। আমরা চাই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যে একটা প্রকৃত মিলন করতে।

সুমিত বলিল, তোমাকে আমি যেমন পূর্ব্বে ভালবাসতুম এখনও তেমনি ভালবাসি বরঞ্চ ভালবাসা আরও গাঢ় হয়েচে, মাষ্টারমশাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুকুও কমেনি। তবে So-called discipline, discretion ও prestige প্রভৃতির দোহাইতে আমাদের নীতি ও কর্ম্মের মিলন হতে পাবে না। তোমরা যদি অগ্রগামী ও প্রগতিমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ কর তবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এক হবে, আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করব। জান, ফুলকোয়ারা আজ বলছিল, আমাদের দক্ষিণ ও বাম কথা দু'টি তুলে দেওয়া উচিত। কারণ তাতে আমাদের উভয়েরই অসম্মান করা হয়। দক্ষিণপন্থীগণকে বলেচে, ওরাই হ'ল প্রকৃত দক্ষিণপন্থী যারা সাহস করে অগ্রসর হতে পারে না, প্রতি পদক্ষেপে ভয় পায়, প্রবল জাতি অথবা দলের নিকটে অহিংস বিশ্বপ্রেমিক আর সহ-কর্ম্মীদের উপর পরোক্ষভাবে হিংস ও ডিক্টেটর। দক্ষিণপন্থী ওরাই যারা নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে প্রলুব্ধ হয়, ক্ষমতার অহমিকা আঁকড়ে থাকে এবং ভাবপ্রবণ ও ধর্ম্মপ্রবণ জাতিকে শ্লোগণ দ্বারা ডিক্টেটরির উপাসক করে তোলে। দক্ষিণপন্থী ওরাই যারা মনে করেন শুধু ওদের ত্যাগ, সেবা ও সুবিবেচনার দ্বারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি এত বিরাট আকার ধারণ করেচে এবং শত শত ছোট কর্ম্মীর ত্যাগ, লাঞ্ছনা ও সেবার কথা স্বীকার করেও কার্য্যক্ষেত্রে গ্রহণ করতে রাজি নন। দক্ষিণপন্থী ওরাই যারা অপর সহকর্ম্মীদের চিরশিশু করে রাখতে চান এবং অপরের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে ভরসা পান না অথবা অপরের ক্ষমতার ও বিচার বুদ্ধির সম্মান রক্ষা করতে পারেন। ফুলকোয়ারা বলে, This defination is applicable to all organisations.

ধীরে ধীরে চাঁদ উঠিতেছে। পুকুর পাড়ের উচু বট গাছটার জমাট বাঁধা ছায়া অতিক্রম করিয়া চাঁদের আলো পুকুরের শেওলা পড়া জলে পড়িয়াছে। রৌদ্রে পোড়া ঘাসগুলির কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পুনরায় মাথা গজাইয়া উঠিতেছে।

সুমিত সীমন্তীর হাত ধরিয়া বলিল, কথা কইছ না যে!

সীমন্তী একটু ভাবিয়া সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল, আজ নেতৃত্ব নিয়ে চলেচে বিরোধ। নেতৃত্বের সমস্যা না থাকলে আজ হিন্দু-মুস্লিম সমস্যাও এত অধিক জটিল হয়ে উঠত না। সুমিত, নেতৃত্ব নিতে হয় কার্য্যে—কথা বা সমালোচনায় নয়। যেদিন তুমি আমায় অতিক্রম করে গিয়ে নেতৃত্ব অধিকার করবে সেদিন আমি প্রলাপ বকব না, অবসর গ্রহণও করব না, আন্তরিক অভিনন্দন জানাব এই বলে যে, বৃহত্তর কাজে আমার চেয়ে বড় ও শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়েচে। সত্য সত্যই সে সুদিন যখন আসবে তখন সমগ্র জাতির এ বিরাট কল্যাণের সূচনাকে কল্যাণ বলে যদি মেনে নিতে না পারি তবে ব্যর্থ আমার সাধনা, ব্যর্থ আমার সংগ্রামাত্মক জীবন ও দেশসেবা।

সীমন্তী একটু অনুরোধের সুরে বলিয়া চলিল, তোমরা গণ-আন্দোলন অর্থাৎ গণ-আইন অমান্য আন্দোলন করতে চাও। কাকু বলেন এখনও সময় হয়নি, দেশবাসী এ বিরাট অগ্নি পরীক্ষার জন্য এখনও প্রস্তুত হতে পারেনি। গত আন্দোলনে যারা নির্য্যাতন দুঃখ পেয়েচে ওদের অনেকেই দূরে সরে দাঁড়িয়েচে এবং আরও সবে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুমিত বলিল, তোমার কথায় যুক্তি আছে, দূরদৃষ্টিরও পরিচয় মিলে কিন্তু তা' বলে দেশবাসী প্রস্তুত হয়নি বলে শুধু প্রবন্ধ লিখলে অথবা

বক্তৃতা করলে চলবে না। হয়ত গণ-আন্দোলনের জন্য দেশবাসী প্রস্তুত হয়নি কিন্তু এর জন্য কি শুধু দেশবাসী দায়ী? আমার মতে জনসাধারণ মোটেই দোষী নয়, কারণ যাদের প্রাণ জীবন্ত নয় ওদের দোষ দেওয়া যায় না। প্রাণহীনের কাঁধে দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষায় কৃতিত্ব নেই—প্রকৃত দোষ আমাদের, ত্রুটি ও অক্ষমতা আমাদেরই!

: তুমি এত তীব্র ভাবে আক্রমণ কর যে, আমার রীতিমত ভয় লাগে।

সুমিত হাসিয়া বলিল, ও রাজনীতি।

: রাজনীতি! রাজনীতি বলে ভালবাসার কোন মূল্য থাকবে না। রাজনীতির জন্য তুমি আমায় বর্জ্জন করে চলবে—না? সত্যি সেদিন আমার কি যে ভাবনা হয়েছিল, সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি আমার মনে হয়েছিল, এই যদি রাজনীতি হয় তবে আমি এইখানেই রাজনীতি শেষ করলুম।

: সীমন্তী!

: কী?

: তুমি আমায় ঠাট্টা করচ না পরীক্ষা করচ?

: মানে।

: মানে তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে বল যে, ভালবাসার জন্য রাজনীতি ত্যাগ করতে পার! তুমি নিজের হাতে বিবেকানন্দবাবুকে হত্যা করতে গিয়েছিলে মনে আছে সে কথা?

: বিবেকানন্দ!

: হ্যাঁ, আমার বোন সুলেখার স্বামী বিবেকানন্দবাবু।

সীমন্তী উচ্ছ্বসিতভাবে সুমিতকে ধরিয়া বলিল, সে রাজশ্রীর মৃত্যু

হয়েচে সুমিত। দেশদ্রোহী, দলদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায়, হীন স্বার্থপরতায় সেই কৈশোরের ভালবাসার নির্ব্বাণ হয়ে গেচে।

সুমিত কোন কথা বলিতে পারিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, অতীত স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিয়া সে ভাল করে নাই। সীমন্তী যাহা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া যাইতে চাহে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া সে সীমন্তীর দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করিয়াছে।

চাঁদের জ্যোৎস্নাধারা আসিয়া ঝর্ণাধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। নীল আকাশের ছোট ছোট তারকাগুলি মিট মিট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

সুমিত সীমন্তীর আঙ্গুলগুলি নিজের আঙ্গুলের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া বলিল, আমি কাল পরশুর মধ্যে এখান থেকে চলে যাব।

: কেন ?

: এখানে আমার থাকা হবে না, কাজে আহ্বান এসেচে।

: কোথায় ?

: ঢেঙ্কানল রাজ্যে যাব। চিত্রাদেবী তার করেচেন ; কালই আমার রওয়ানা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

: তোমার অভিমান করে যাওয়া হবে না। তুমি চলে গেলে আমি কাজ করতে পারব না—আমি শক্তিহীনা, পঙ্গু। তুমিই আমার প্রেরণা, শক্তি।

: সীমন্তী, তোমার মুখে এমন কথা আমি প্রত্যাশা করিনি।

: তুমি রাগ করে চলে যাবে আর আমি ঘরে বসে কাঁদব, এত দুর্ব্বল আর আমি নই। অনেক সয়েচি, আর নয়, দেখব তুমি কত বড় নিষ্ঠুর, কেমন আমায় ত্যাগ করে যেতে পার।

সুমিত হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি বড্ড ছেলে মানুষি করতে শিখেচ।

: আমি যা বলি সবই তুমি ছেলে মানুষি মনে কর। সত্যি আমি সিরিয়াসলি বলচি। স্পষ্ট তোমায় জানাচ্চি, ছেলেমানুষই বল আর যাই বল কেন বল তোমাদের যাওয়া হবে না। এখানে এখন আমাদের শক্তির ও চেষ্টার কেন্দ্রীভূত সমন্বয় চাই—শক্তিকে বিভক্ত করে দু'খানেই ব্যর্থ হবার সর্ব্বনেশে পথ গ্রহণ করা চলতে পারে না-না।

: এবার আমি আশ্বস্ত হলুম। এতক্ষণ তুমি কি সব sentimental কথা বলছিলে, আমার রীতিমত আশঙ্কা হচ্ছিল। তুমি ত' আর মানুষ নও, তোমার মধ্যে প্রেম নেই, সংসার ধর্ম্মের প্রবৃত্তি নেই, স্বাভাবিক মানবীয় ধর্ম্মও নেই—তুমি পাথর, তুমি একটা শক্তি, তুমি আগুন।

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, আমি মরে গেলে আমার জীবনী লিখবে ত'?

: বাঃ, তুমি আগে কেন মরবে।

: হুঁ! তোমার জীবনী লিখবার জন্যে আমি বসে থাকব না; ও সব হবে না। আমি এত বড় ট্রাজিডি সইতে পারব না—আগেই বলে রাখচি।

: কিন্তু আমার দুঃখের জীবন লিখবার জন্যে ত' তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তুমি লিখবে, আমার অপরূপ, অটুট যৌবন, দেহ সৌষ্ঠব নারীত্ব, মাধুর্য্য ও মহত্ব দিয়ে সুমিতকে উন্মাদ করে দিয়েছিলাম, নীরেট মানুষের মধ্যে ভালবাসা এমন ভাবে জাগ্রত করে দিয়েছিলাম যে, সুমিত নিজের জীবনের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসত'—কিন্তু কখনও ওকে ধরা দিইনি। ভালবাসিয়ে না ধরা দেওয়ার ট্রাজিডিই সুমিতের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি ছিল।

সীমন্তী সুমিতের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কৃত্রিম ক্রোধে বলিল, চুপ কর, মিথ্যাবাদী।

: আমি মিথ্যাবাদী—তুমি আমায় ছুঁয়ে বলতে পার যে আমার শত কাতর অনুরোধেও আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করনি। তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলনি যে, দাম্পত্য জীবন ও সংসারধর্মের চেয়ে দেশসেবা অনেক বড়। দেশসেবা ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে তুমি দৃঢ়ভাবে বলনি যে আমাদের বিয়ে হতে পারে না।

: তা' হয়ত এক সময় বলেছিলুম কিন্তু তুমি ভিক্ষে না চেয়ে দাবী করনি কেন, তোমার অধিকারে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি কি আমার ছিল, না আছে। পরের দোষ যে খুব বড় করে দেখচ, একথা কি মেয়েমানুষ হয়ে আমায় বলে দিতে হবে যে, নারী দাতা নয়—সে বিজিতা। ন্যায্য পাওনা জোর করে সব আদায় করে নিলেই নারী পায় পূর্ণতা, তার জীবন হয় চরম সার্থক।

সুমিত সীমন্তীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আমি এ কথা জানতুম না কিন্তু জন্মগত অধিকার সূত্রে পাওয়া আমার পৌরুষ হয়ত জানত'—

: যদি জানত' তবে কেন সে বিজয় অভিযান করেনি ?

: দেশমাতা দেবী, তিনি যখন কোন নর নারীর মধ্যে আবির্ভূত হন তখন সাধারণ মানুষকে দূরে থাকতে হয়।

: কিন্তু দেবী যখন দেবের শ্রীচরণে পতিত হয়ে প্রেম ভিক্ষা করেন তখন দেবতার বক্ষে তুলে নেওয়া উচিত নয় একথা কোন ধর্মের অনুশাসন সুমিত ?

সীমন্তী অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুমিতকে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

সুস্মিত দুই হাতে সীমন্তীকে তুলিয়া ধরিয়া পকেট হইতে একটি সাত লহর সোনার হার বাহির করিয়া সীমন্তীর গলায় পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, মা যখন নববধূ হয়ে আসেন তখন ঠাকুরমা নববধূর মুখ দেখে এ হার গলায় পরিয়েছিলেন। মা মারা যাবার সময় এ হার আমার গলায় পরিয়ে গিয়েছিলেন। বড় দুঃখ নিয়ে গেচেন যে এ হার ছড়া দিয়ে বধূ বরণ করতে পারেন নি। তোমার জন্যেই হয়ত তখন আমার বিয়ে হয়নি। মন্ত্র পড়ে আচার অনুষ্ঠানে বিয়ে কখনও এ জীবনে হবে কিনা সে তুমিই জান আর জানেন আমাদের দেশমাতা। নানাদিক হতে তোমার আহ্বান কখন কোথায় যে তোমায় ঠেলে নেবে সে তুমিও জান না, আমিও না। তারপর কয়েকদিন ধরে আমার মনও আসন্ন বিচ্ছেদের শঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠেচে, তাই মার শেষ বাসনা পূর্ণ করলুম—তুমি গ্রহণ কর সীমন্তী।

মা'র আশীর্ব্বাদ—মা—! সীমন্তী দুই হাতে হাড় ছড়া বুকে ললাটে জড়াইয়া ধরিল।

সুস্মিত বলিল, এবার চল, সীমন্তী, ওঠ!

সীমন্তী উঠিল না, ধীরে ধীরে সীমন্তীর কোলে মাথা এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কংশনদী

নদীর জল একেবারে তলদেশে নামিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে হাঁটিয়া নদী পার হওয়া যায়। যদিও নদীতে বেশি জল নাই, তথাপি খরস্রোতা। সারাক্ষণ একটা প্রবল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। প্রবল গ্রীষ্মের তাপের পর কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় মরা নদীর রূপ ফিরিয়া গিয়াছে, নব প্রাণের আভাষ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিতেছে। যে নদীতে কয়েকদিন পূর্ব্বেও বিশেষ জল ছিল না, ইতস্তত বালির চর মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, বড় বড় নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল,— সে নদীতে আজ চরগুলি ডুবিয়া গিয়াছে, জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ব্যবসায়ী নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দূর হইয়াছে।

সীমন্তীর হাত ধরিয়া সুলেখা চলিয়াছে। নির্জ্জন পথ, নিস্তব্ধ রাত্রি। কয়েক দিন পূর্ব্বে এ অঞ্চলে মহামারির যে তাণ্ডব লীলা হইয়া গিয়াছে তাহার বিভীষিকা এখনও লোকজনের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। সন্ধ্যা রাত্রিতেই সকলে দরজা বন্ধ করিয়া শয্যা গ্রহণ করে, রাস্তা ঘাটে কেহ কদাচিত বিশেষ প্রয়োজনে বাহির হয়। চারিদিকে কেমন একটা আতঙ্ক, মৃত্যুর বিভীষিকা আর দারিদ্র্যের ও রোগের ভয়াবহ অত্যাচার।

ক্ষুদ্র নগরী, বস্তি ও পল্লী অঞ্চল সমস্তই যেন শোকাচ্ছন্ন। যাহারা এত বড় মহামারিতেও বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারা যেন স্বাস্থ্যহানি ও অভাবের পীড়ন সহ্য করিবার জন্য রহিয়াছে। শক্তি নাই, প্রেরণা নাই,

শান্তি নাই, জীবন নাই, অর্থ নাই খাদ্য নাই—আছে নিস্পৃহতা, শোক, জড়তা ও নিষ্ক্রিয় চেতনা।

নির্জ্জন পথে সীমন্তী ও সুলেখা চলিয়াছে। সুলেখার মনে কেমন একটা আতঙ্ক, কেমন এক বিভীষিকা। গাছের ডালপালাগুলি একটু নড়িয়া উঠিলে সুলেখার গা ছমছম করিয়া উঠে, কুকুরের চীৎকার করিয়া উঠিলে ভয়ে গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায়।

সীমন্তী আবার বলিল, তুমি এসে ভাল করনি সু।

সুলেখা মাথা ঝুঁকিয়া প্রতিবাদ করিল, মুখে কোন কথা বলিল না।

সীমন্তী বলিয়া চলিল, তোমার বাবা যদি জানেন তবে বিষম অনর্থ বাঁধবে। তুমি জমিদারের মেয়ে হয়ে রাত্রে হেঁটে হেঁটে চলছ—

সুলেখা বাধা দিয়া বলিল, দাদাকে আমি কত ভালবাসি তা' তুমি জাননা বলেই অমন বাধা দিচ্ছ। মা যখন মারা যান তখন আমরা ভাই বোন বেশি বড় ছিলুম না। দাদা যদিও আমার চেয়ে বয়সে বড় তবু সে চিরকাল শিশুর মত ছিল। মার মৃত্যুতে দাদা কত কেঁদেচে, সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিল না, বাবাও ওকে সান্ত্বনা দিতে পারেননি, আমাকে জড়িয়ে ধরে দাদা সান্ত্বনা পেয়েচে। সে দিনের কথা তুমি জান না, আমি না খাওয়ালে দাদা কখনও খেত না, আমি পাশে শুয়ে গায়ে হাত না বুলালে দাদা কখনও ঘুমাত না।—সেই দাদার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে সত্য কিন্তু Continent ঘুরে আসার পর কিছুকাল পূর্ব্বেও দাদার প্রতি কাজে আমাকে না হলে চলত না।

ঃ সুলেখা, তুমি কি তোমার দাদাকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছ?

ঃ হ্যাঁ, আমি গিয়ে বাধা দিলে দাদা কিছুতেই যেতে পারবে না।

: তা' হয়না সুলেখা। সীমন্তীর স্বরে কঠিন দৃঢ়তা।

সুলেখা অবাক হইয়া সীমন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, বলচ কি তুমি। সেখানে গোলাগুলি চলচে, যে কোন লোকের যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণনাশ হতে পারে, তার মধ্যে দাদাকে যেতে দেব ?

: তা ভিন্ন উপায় কি! যারা দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েচে তাদের দেশের পূজায় যদি প্রাণদানের প্রয়োজন হয় তবে প্রাণ দিতেই হবে কারও অসঙ্গত বাধা দেবার অধিকার নেই!

: তুমি বলছ কি,নিজে নারী হয়ে এমন ভয়ঙ্কর কথা বলতে পারচ ?

: সংসার ধর্ম্মে আমি শুধু নারী—দেশের কাজে আমি নারী নই, পুরুষও নই মাত্র একটা শক্তি। দেশের স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যেমন সর্ব্ব ধর্ম্মের ধ্বংসের প্রয়োজন তেমনি নর ও নারীর পার্থক্যও ধ্বংসের প্রয়োজন। প্রকৃতির পার্থক্য এড়াবার উপায় নেই কিন্তু মনোভাবটা আমাদের গড়ে তুলবার ক্ষমতা আছে। সে কথা যাক, কথা হচ্চে, তোমার দাদার যাওয়া অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তারপর সেখানে গেলেই লোকে মরে না।

: কিন্তু সেদিনও ত' বহু লোক গুলি খেয়ে মরেছে ও আহত হয়েচে।

: কাজের আহ্বানে গুলি বা পীড়নের ভয়ে পিছিয়ে থাকা যায় না—যারা পিছিয়ে যায় তাদের স্থান এখানে নয়। শত্রুর হতে মুক্তি লাভের যে সংগ্রাম তাতে প্রাণ দেওয়াটা শোকের নয়—মোক্ষ লাভের এই একমাত্র রাজপথ।

সুলেখা ভয়ে সীমন্তীর হাত ধরিয়া বলিল, আমি জানতুম তুমি দাদাকে ভালবাস।

সীমন্তী হাসিয়া বলিল, এখন কি মনে হচ্চে ভালবাসি না, ভালবাসার ছলনায় তোমার দাদাকে কেড়ে এনেছি মাত্র ?

: লোকে তাই বলে কিন্তু আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। আমার কেন জানি মনে হয় তুমি দাদাকে সত্য সত্যই ভালবাস,—আমিও তেমন ভাবে আমার স্বামীকে ভাল বাসি না। যখন তোমাকে চিনতুমনা তখন তোমার অনেক নিন্দা করেচি, অনেক কুৎসা গেয়েচি কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গেচে। সবই জানি কিন্তু এ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে যে, এত ভালবেসেও তুমি কি করে দাদাকে এমন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পার। ভগবান করুন, গোলাগুলি হয়ত' আর চলবে না কিন্তু দাদাকে ত' তোমার চিনতে বাকি নেই। যার খাওয়া পরার কথা মনে থাকে না, রোগ-শোকের কথা বিস্মৃত হয়, দেহের উপর অত্যাচার করে মহাবিপত্তি টেনে আনে তাকে কি করে এমন অসভ্য দেশে পাঠাচ্চ, যেখানে এখন আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই, খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা নেই, মাথা গুজবার নিরাপদ ঠাঁই নেই।

সীমন্তীর দুর্ব্বলতায় যেন আঘাত পড়িল। সে এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কিছু বিচার করে নাই। তাহার মনে হইল সুমিতকে যেখানে সেখানে পাঠান যায় না—নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার স্বাভাবিক ও সঙ্গত বৃত্তিটা পর্য্যন্ত সুমিতের আজও পরিস্ফুট হয় নাই।

সুলেখা বলিয়া চলিল, দেশীয় রাজ্যকে কি কখনও বিশ্বাস করতে আছে, কখনও বিশ্বাস করতে নেই। কংগ্রেস কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হয় অথবা কোন বিরোধী দলের কাছে অপমানিত হয় তখন বিদ্রোহী ও স্পষ্টবাদী

সহকর্ম্মীদের উপরই সকল রাগ জমে—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, এর ঝুরি ঝুরি উদাহরণ কংগ্রেস উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে এবং বাংলা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে রয়েছে।

সীমন্তী কোন জবাব দিল না, তাহার মনে হইল, সুমিতের মত আত্মভোলা, সরল ও নির্ব্বিকার লোককে এ বিপদের মধ্যে একা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

সুলেখার হাত ধরিয়া বলিল, সে হতে পারে না। আমি ওঁকে একা একা সেখানে যেতে দিতে পারিনে।

সুলেখা বলিল, দাদা একগুঁয়ে মানুষ, পারবে তাকে বাধা দিতে?

ঃ বাধা দিতেই হবে—যে ভাবেই হোক। সীমন্তী গলার সাতলহর হার-ছড়া দেখাইয়া বলিল, এরই জোরে আমি ওঁকে বাধা দেব—পারব না বোন?

সুলেখা হারটির দিকে চাহিয়া একটু অবাক হইয়া বলিল, এ হার—হারটি তুমি কি করে পেলে দিদি?

ঃ এ হার! সীমন্তীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, তোমার দাদা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, মার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর সীমন্তী! একে পাওয়ার বেলায় আড়ম্বর ছিল না এতটুকুও, কিন্তু গলায় পরে কেমন যেন বদলে গেলুম, শিরায় শিরায় রক্তে নেমে এল অদ্ভুত এক আনন্দের বন্যা, মনে হ'ল এ হার ছড়ায় যেন আমার নবজীবন ধরা দিল—আমি নতুন হয়ে গেলুম সুলেখা! বার বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মাকে উদ্দেশ করে প্রণাম করেচি। আমি জানি, অনুভব করেচি—মা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করেচেন। তার পর দেখো, একদিন সবটুকু মেঘ যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে—

বাবার আশীষও অধিকার করতে পারব, তখন শুধু সন্তানের দাবী নিয়ে নয়, আমাদের সত্যিকারের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে।

সুলেখা সীমন্তীকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, ভগবানের নিকট আমি এই প্রার্থনা করব সর্ব্বদা।

সীমন্তী বলিল, আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি চল বোন, পরে হয়ত দুঃখই হবে শুধু মার।

সুলেখা ও সীমন্তী কথা কহিতে কহিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল।

ঘাটে বজরা বাধা। সুমিত, ফুলকোয়ারা, আশীষ, আলতাফ, সুরেশ চৌধুরী, নিরঞ্জন এবং বহু কংগ্রেসকর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ঘাটে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে।

পূর্ব্বাকাশে এইমাত্র চাঁদ উঠিয়াছে। তরল রৌপ্য জ্যোৎস্না ধারা নদীর অনাবৃত দেহলতায়, গাছের শাখায় শাখায়, সুদূর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রবাহিত হইতেছে।

সীমন্তী ও সুলেখা যখন নদীর পাড়ে আসিয়া পৌঁছিল তখন বিদায়াভিনন্দনের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকগণ 'বন্দেমাতরম' বলিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইল।

ফুলকোয়ারাকে সুমিতের হাত ধরিয়া বজরায় উঠিতে এবং সুমিতের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সুলেখা চমকিয়া গেল।

সীমন্তী সুলেখার হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিল, চল।

বজরার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝিরা দাঁড় টানিতেই সুলেখা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, দাদা—কিন্তু বন্দেমাতরম

ধ্বনিতে সুলেখার কণ্ঠস্বর মিশিয়া গেল। নৌকা চলিতে সুরু করিয়াছে। সীমন্তী সুলেখার হাত ছাড়িয়া দিয়া দৌড়িয়া ঘাটে গেল এবং হাত তুলিয়া নৌকা থামাইতে বলিল।

সুমিত সীমন্তীকে ঘাটে দেখিয়া মাঝিকে নৌকা থামাইতে বলিল। মাঝিরা সীমন্তীকে চিনে, কাজেই তাহারা সীমন্তীকে দেখা মাত্রই দাঁড়-টানা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সুমিতের হুকুমে মাঝিরা পুনরায় বজরাটি ঘাটে নিয়া ভিড়াইল।

সুমিত বজরার উপর হইতেই সহাস্যে বলিল, সময় আর নেই, এখান হতেই বিদায়াভিনন্দনের পালা শেষ করি 'মন্তী!

সীমন্তী কোন কথা বলিল না, বজরার উপর উঠিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। সুমিত মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া সীমন্তীর হাত ধরিয়া উপরে তুলিয়া লইল।

সীমন্তী অনেক কিছুই বলিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল. অনেকবার ভাবিয়াও ছিল কিন্তু সুমিতের পাশে দাঁড়াইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না, সুমিতের হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সুমিত বলিল, তোমার কোন হুকুম আছে সী?

সীমন্তীর উত্তর করিবার পূর্ব্বেই সুলেখা বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ। এত লোকের সুমুখে বলতে হয়ত কংগ্রেস সভানেত্রীর মুখে বাধবে কিন্তু আমার মুখে বাধবে না দাদা।

সুমিত অবাক হইয়া বলিল, সু তুই এখানে কি করে?

সুলেখা উপরে উঠিয়া আসিতে আসিতে বলিল, পালিয়ে এসেচি।

সুলেখা সুমিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, আমার জন্যে তোমার

ভাবতে হবে না—হয়ত এর জন্যে বাবাকে অনেক দুঃখ দিতে হবে, আমার অনেক নিষ্ক্রিয় নির্য্যাতনও সইতে হবে—তা হোক। কিন্তু—

সুমিত বলিল, তোমরা আমার সঙ্গে যেতে চাও ত' কিন্তু প্রয়োজন হ'বে না কারণ, সুমিত ফুলকোয়ারা ও আশীষকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিল।

সুলেখা উত্তেজিত স্বরে বলিল, সেখানে গোলাগুলি চলচে, সার্জ্জেণ্টের হাণ্টার, সৈন্যদের বেয়নেট ও পুলিশের লাঠির অরাজকতা, আর ক্ষিপ্ত প্রজাদের বিদ্রোহ—তার মধ্যে ফুলকোয়ারা ও আশীষের ভরসায় তোমার মত একজন চিরশিশুকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে বলচ দাদা, আমার কি আজও তোমায় চিনতে বাকি আছে।

সুলেখা সীমন্তীর গলার হারটি দেখাইয়া বলিল, এ হার যখন পরিয়েচ তখন তোমার খামখেয়াল, স্বেচ্ছাচার ও পরোক্ষ অত্যাচার চলতে পারে না। তোমাদের দেশসেবা কি কর্ম্মপদ্ধতি ও জীবনধারার নিয়মকানুন কি আমি জানিনে কিন্তু একথা জানি, সীমন্তীকে আঘাত করবার তোমার অধিকার নেই, তাতে দেশসেবা তোমার ব্যর্থই হবে।

সুমিত মৃদু হাসিয়া বলিল, তুই কি বলতে চাস তা বুঝতে পেরেছি। বোকার মত আত্মদান করা বা বিপদে পড়া রাজনীতি নয়, আত্মরক্ষা করে চলাই রাজনীতি। সে সকল জটিল ও সূক্ষ্ম প্রশ্ন এখানে উঠচে না। আমি কংগ্রেস কর্ম্মী—যে কোন ত্যাগ, যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়াই কংগ্রেস কর্ম্মীদের নবজন্মগত প্রকৃতি। দীক্ষার পর যাদের এ স্বভাব হয়নি তারা কংগ্রেস কর্ম্মী নয়। তবে মানুষের ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, স্ত্রীপুত্র কন্যা, প্রণয়িনী, পিতামাতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু সু একটা তোমরা বুঝতে পারবে না যে, সবার

উপরে মানুষ হবার ব্রত যারা গ্রহণ করেচে তাদের ছোটখাট আকর্ষণ, দায়িত্ব, কর্ত্তব্য বৃহত্তর প্রয়োজনে ত্যাগ করতে হয়। জন্ম-ভূমিকে স্বাধীন করাই যে ভারতবাসীর মানুষ হবার প্রথম সোপান।

সুলেখা বলিল, আমি সাধারণ মানুষ সহজ কথা বুঝি, ব্যবহারিক জীবনে বইএর কথা কিংবা সভামঞ্চের বক্তৃতার মূল্য বুঝিনে।

সুমিত বলিল, সীমন্তীই ত' তোমার সমস্যা, বেশ ওকেই জিজ্ঞেস কর। রাজনীতি ক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে আমাদের কতবড় বিভেদ হয়ে গেচে, তবু উনি কংগ্রেসকর্ম্মী। চিত্রা দেবী তার করেছেন প্রায় ৩৬ জন বন্দী জীবন পণ করে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করেচে—এ অবস্থায় আমার অবিলম্বে যাওয়া ও কর্ত্তব্য কিনা উনিই বলুন।

সীমন্তী সুমিতের হাত ধরিয়া বলিল, তোমার নিকট আমার এত বড় পরাজয়ে আমি গৌরব বোধ করচি সু। একদিন আমার আকর্ষণে আমার প্ররোচনায় তুমি এ পথে এসেছিলে, আমিই তোমায় দীক্ষা দিয়েছিলুম কিন্তু প্রকৃতির অপরিহার্য্য পরিণামে নারীর পরাজয় হল পুরুষের কাছে—তাতে আমার গর্ব্ব, গৌরব। আমি তোমার বাকদত্তা পত্নী—কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি তোমার কমরেড। তোমার পরশে আমি হারান শক্তি পেয়েচি—এই ত' আমাদের প্রণয়ের চরম সার্থকতা। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি, আমাদের ভালবাসা যেন এমনি করে সার্থক হয়, কখনও যেন কাপুরুষতা ও দৌর্ব্বল্যে কলঙ্কিত না হয়।

সুলেখা শঙ্কিতভাবে বলিল, সীমন্তি!

সীমন্তী বাধা দিয়া বলিল, ভয় পাচ্ছ বোন, কিন্তু আমরা যে

বিপ্লবপথের যাত্রী! কর্ম্মস্রোতে আমরা কে কখন কোন পথে চলে যাই তার কোন স্থিরতা নেই। সুমিতের সঙ্গেই হয়েচে আমার কর্ম্ম-নীতির প্রবল সংঘাত, হয়ত' দুজনকেই বিপরীত মুখ করে চলতে হবে যুগ যুগ ধরে—যে পর্য্যন্ত না আমরা চরম লক্ষ্যে পৌছাতে পারি। তা'তে দুঃখ করবার কিছুই নেই বোন।

সীমন্তী সুলেখার হাত ধরিয়া দরদ দিয়া বলিয়া চলিল, আমি পাষাণী নই, মহাপুরুষও নই, ওঁর জন্যে কম ভাবনা আমার নয়—সারাক্ষণ দুর্ভাবনায় যে কাটাতে হবে তা স্বীকার করতেও লজ্জিত নই কিন্তু আমরা বিপ্লবপথের যাত্রী। প্রেমাস্পদকে এমনি করেই আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ের বরমাল্যে সাজিয়ে দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয়। সুখ দুঃখ, জীবন মরণ ও অত্যাচার পীড়নের কথা কাপুরুষের মত বিবেচনা না করাই বিপ্লবের মূল নীতি।

মাঝিরা তাগিদা দিয়া বলিল, কর্ত্তাবাবু, আর দেরি করলে গাড়ি পাওয়া যাবে না। হুকুম করুন কর্ত্তা!

সুমিত বলিল, সী!

সীমন্তী বলিল, যাচ্ছি সু!

সুলেখা অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল, দুঃখকে ছাপিয়া উঠিল বিস্ময়। মনে হইল এরা মানুষ নয়, এদের শরীরে রক্ত মাংস নাই—এরা অগ্নিশিখা, আশ্চর্য্য, অসম্ভব অস্বাভাবিক ঘটনা।

সুলেখা ভালবাসিয়াছে, ভালবাসার রূপ সে চিনে, বিরহ ব্যথাও পাইয়াছে, অপরের ব্যথাও সে অনুমান করিতে পারে। সুমিত ও সীমন্তীর চাহনির ভাষাও তাহার নিকট গোপন রহিল না, সংযমের

অত্যাচারে নিপীড়িত মনের কথাও আর চাপা পড়িয়া রহিল না। তাহার মনে হইল, এরা যতই সংযমের অত্যাচার করুক না কেন, আজিকার এই বিচ্ছেদেই এদের নিকটতম মিলনের রাজপথ গড়িয়া উঠিতে সুরু করিল। রাষ্ট্র, দেশ, মানবতা, মনুষ্যত্বের সংগ্রাম এদের আপন সত্তা গ্রাস করিয়াছে—এরা নিঃস্ব, এরা দেউলে কিন্তু আজি হইতে আর পৃথক সত্তার আহুতি হইবে না—মিলিত আত্মারই আহুতি হইবে।

সীমন্তী গলায় আঁচল দিয়া সুমিতকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমাদের কর্ম্মপন্থা পৃথক হোক, কিন্তু আমি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করি—তুমি জয়যুক্ত হও। তোমার জয়রথের শব্দের জন্য কান পেতে রইব—জয়মাল্য পরাব বলে।

ফুলকোয়ারা ও আশীষ আসিয়া সীমন্তীকে প্রণাম করিয়া বলিল, তাই আশীর্ব্বাদ কর দিদি—আমরা যেন জয়যুক্ত হয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারি।

সুমিত ভয়ে ভয়ে বলিল, সুলেখা—!

সুলেখা বলিল, আমিও যাচ্ছি, তোমার ভয় নেই দাদা, নিশ্চিন্ত যাওয়ার পথে বাধা দিয়ে আমি আর অকল্যাণ ডেকে আনব না। তুমি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, তুমি দুর্ব্বিনীত ও দুর্জ্জেয়—তোমার পাষাণতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যে হয়ত তোমার দেশসেবার ব্রতকে অভিশাপ দিতুম কিন্তু কার জন্যে আর অভিশাপ দেব। পাষাণীই যে তোমায় পাষাণ করে তুলেচে—এই পাষাণতার মধ্যেই ত' তোমাদের সার্থকতা।

সুলেখা তাড়াতাড়ি সুমিতকে প্রণাম করিয়া, বিগলিত অশ্রুধারা লুকাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বজরা হইতে নামিয়া গেল।

সুমিত ডাকিল, 'মন্তী!

সীমন্তী সুমিতের চোখে চোখে একবার চাহিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, আমি যাই সু' !

সীমন্তী ধীরে ধীরে বজরা হইতে নামিয়া আসিল এবং স্বেচ্ছাসেবক-দের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বজরা চলিতে সুরু করিল।

চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না দিগন্ত ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাদা রঙের বজরাখানি ঢেউয়ের তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বজরার শুভ্র পালে, শুভ্র ছাদে চাঁদের আলোক পড়িয়াছে, নদীর তরঙ্গভঙ্গে জ্যোৎস্না পড়িয়া যেন শত শত টুকরা হইয়া হাসিয়া লুটাইতেছে।

বজরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুমিত রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ পারে সীমন্তী সুলেখার হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। ঝাঁপসা চোখের অদ্ভুত এক চাহনি।

ধীরে ধীরে বজরা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল, ঝাপসা চোখ রগড়াইলেও আর দেখা যাইবে না, দিগন্ত মুখরিত চীৎকারেও হয়ত আর কোন কথা শোনা যাইবে না।

কংসনদীতে এখনও মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতেছে। চাঁদের আলো একটু ম্লান হইয়া আসিয়াছে মাত্র। নিঝুম রাত্রে শুধু শোনা যায় নদীর কল কল তান। কান পাতিয়া রহিলে হয়ত নদীর শাশ্বত বাণী শুনিতে পাওয়া যাইবে।